প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

প্রকাশক
তমস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রণ
গোপীনাথ আর্ট প্রেস
১৫, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রীতারাপ্রসন্ন বাগচী ও পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া মাতৃদেবী শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে।

সেদিন শ্রাবণের শেষ। বাইরে বারি বর্ষণ হচ্ছে। ঘরে আমাদের চা-চক্র চলছে। এমন সময় অনেক কিছু আলোচনার মধ্যে হঠাৎ স্ত্রী প্রশ্ন তুললেন যে এবার কোথাও বেড়াতে গেলে হয় না? আমি অবশ্য তার উত্তরে আমার বহুদিনের মনোবাসনার কথা বললাম। এবং এও বললাম যদি তুমি ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করতে পারো তবে আমি অনেক ইতিহাস প্রসিদ্ধ এবং ধমস্থান দেখিয়ে আনতে পারি। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। কিছুদিন পর আমি একটি ভ্রমণ তালিকা প্রস্তুত করে চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইস্টার্ন রেলওয়ে ৩নং কয়লা ঘাটা রোড এ নন কনডাকটেড টুরের টিকিটের জন্য দরখাস্ত পেশ করলাম। রেলওয়ে আইনে তাদের অনেকগুলি কনডাকটেড টুরের তালিকা-আছে। তার সঙ্গে এ আইনও আছে যে যদি কেউ এ ছাড়া অন্য সার্কুলার টুর প্রস্তুত করে টিকিটের জন্য দরখাস্ত করেন তবে সে টিকিটও দেওয়া হবে। সেই আইনের সুবিধা নিয়ে আমি একটি দরখাস্ত দিলাম। এর সুবিধে দুরকম। অর্থের দিক দিয়ে যেমন কিছু সুবিধে হয় আবার প্রত্যেক স্টেশনে টিকিট কাটার হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

টিকিটের মঞ্জুরী পেয়ে এক সপ্তাহ পূর্বে টিকিট ক্রয় করে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে শয়নের দুটি স্থান সংরক্ষণ করে এলাম। আমাদের যাত্রার দিন স্থির ছিল ২১শে নভেম্বর ১১ আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে। যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত এটা-ওটা গোছানো নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। আনন্দটা ঠিক তখন উপলব্ধি করতে পারিনি। মাঝে স্ত্রীর শরীরটা হঠাৎ অসুস্থ হল। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করে তাঁকে খাড়া করে দিলেন। নবদ্বীপ থেকে আমরা বিকেল ৩টার ট্রেনে

রওনা হয়ে ঐ দিন রাত্রে ৯-১০ মিঃ হাওড়ায় ১১ আপ ধরে বরাবর দিল্লী রওনা হলাম।

এক দিন দুইরাত গাড়িতে কাটিয়ে আমরা ২৩/শে নভেম্বর সকাল ৬টার সময় দিল্লী শহরে পৌঁছলাম। দিল্লীতে আমার দাদা থাকেন, তাঁর ওখানে গিয়ে উঠলাম। বাংলা দেশ থেকে দিল্লীতে গিয়ে শীতটা বেশ অনুভব করতে লাগলাম। দিল্লী আমাদের বহুবার দেখা আছে, সেইজন্যে শুধু একবার লোকসভার অধিবেশন দেখে এলাম। সেটি অবশ্য শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী মহোদয়ার সৌজন্যে হয়েছিল। প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ সেখানে শুনলাম

দিল্লী থেকে ২৫শে নভেম্বর রাত্রে ১ আপ দিল্লী মেলে রওনা হয়ে ২৭শে ভোর ৫॥০ টায় জয়পুরে এলাম। দিল্লী থেকে ঐ গাড়িতে ৩য় শ্রেণীতে ৩·৭৫ নঃপঃ দিলে শয়নবগীতে সংরক্ষিত আসন পাওয়া যায়। আমাদের কলকাতা থেকে আসন সংরক্ষণ করা ছিল। সেইজন্য কোন অসুবিধে হয় নি। জয়পুরে টুরিস্টদের থাকার অনেক সুবিধে করা হয়েছে। অবশ্য রিটায়ারিং রুমে ছিলাম। প্রাতে আমরা আমাদের প্রাতঃকালীন সমস্ত ব্যবস্থা সমাধা করে যখন প্রাতঃভোজনের জন্য যাচ্ছি তখন একটি ভদ্রলোক সংবাদ দিলেন যে যদি আপনারা শহরের দর্শনীয় স্থান দেখতে চান তাহলে এখানে শৌখীন বাসের ব্যবস্থা আছে তার টিকিট নিতে পারেন। এই শুভ সংবাদে আমরা বিশেষ আনন্দ বোধ করলাম এবং তখনই টিকিট কিনলাম। সকাল ৮॥০ টার সময় একখানি সুন্দর বাস এসে স্টেশনের সামনে দাঁড়ায়। তার ভেতরের ব্যবস্থাও অতি সুন্দর এবং আরামদায়ক। সমস্ত গাড়িটাতে ২৫ জন যাত্রী যাওয়ার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু সেদিন আমরা মাত্র ৪ জন যাত্রী হয়েছিলাম। জয়পুর শহরটি সত্যই অনিন্দ্যসুন্দর অমরাবতীর তুল্য একটি নগর। এর চারিদিকে পর্বতমালা এবং

তারই পদতলে সৌন্দর্যময়ী নগরী ঠিক যেন লজ্জাবতী বধূর মত লুকিয়ে আছে। স্টেশনে নামলে বোঝা যায় না এর সৌন্দর্য, উপলব্ধি করা যায় না এর অস্তিত্ব। প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত একটি মনোরম শহর।

ইতিহাস বলে সোয়াই জয়সিং এই নূতন শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরই নামে ইহার নাম জয়পুর। ইহার দৈর্ঘ্য তিন মাইল এবং প্রস্থ দুই মাইল। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদটি। আমাদের গাড়ি শহরের ভিতর দিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল অম্বর। অম্বর জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। জয়পুর থেকে এর দূরত্ব ৫ মাইল। এই দীর্ঘ ৫ মাইল পথ অতি মনোরম। পথের উভয় দিকে পুরাতন দুর্দশা দেখতে দেখতে চলে এলাম। গাড়ি থেকে নেমে আমাদের হেঁটে অনেকটা পথ উঠতে হল। এই অম্বর নামের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মত আছে। কেউ কেউ বলেন যে অম্বা দেবীর নাম অনুসারে এই শহরের নাম অম্বর। আবার শোনা যায় যে অম্বকেশ্বর শিবের জন্যই এর নাম অম্বর। সেই যাই হোক অম্বরের যা কিছু শোভা সম্পদ সবই মহারাজ মানসিংহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

আমরা উঠতে উঠতে এলাম একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। এখানে অনেকগুলি দেখবার স্থান আছে। যশোমন্দির, সোহাগ মন্দির, রঙ্গমহল দেওয়ানী খাস, অন্দরমহল, শিশ্ মহল, ও শিলাদেবীর মন্দির। আরো কত কি? এই শিলাদেবীর মন্দিরের ইতিহাস বাঙালী-জাতির ঐতিহ্যের সহিত জড়িত।

অম্বরের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করলে মনের ভেতর নূতন প্রাণ সঞ্চার করে। সেটা আমরা বিশেষ করে অনুভব করেছিলাম। ইতিহাস বলে যে এই মূর্তি বঙ্গের বারভূঁইয়ার অন্যতম ভূঁইয়া চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর নগরীতে

অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে ছিলেন। অবশ্য ইহাও প্রচলিত আছে যে প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী নামে পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় গাইড যা বলে তার সঙ্গে ইতিহাসের কথার মিলের অনেক অভাব দেখা যায়। মানসিংহ এই মূর্তি অম্বরের প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী মূর্তি অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঘাগড়ায় ঢাকা সেই কারণে নিচের সিংহের মূর্তিটি ঠিক দেখা যায় না। ডান হাতে খণ্ড তীর ও ত্রিশূল অপর হাতে ঠিক বোঝা গেল না কি আছে। মূর্তিটা যেখানে আছে সেখানে কিছুটা অন্ধকার। পূজারী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি প্রসাদ গ্রহণ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন, কারণ তিনি বাঙালী। যদিও এরা রাজস্থানে বহু যুগ ধরে বসবাস করছেন তথাপি এঁদের বাঙালীর প্রতি মমত্ব ভালবাসা সর্বদাই জাগরিত আছে। এখানে পূর্বে যদিও ভাল ভাবে মায়ের পূজার জন্য নর ও মহিষ বলির প্রথা ছিল কিন্তু আজ শুধু একটি করে ছাগ শিশু বলির ব্যবস্থা আছে। আমরা দেখলাম সেই ছাগ শিশু বলির রক্তের দাগ। অন্তর বেদনায় মথিত হয়ে উঠল। মনে হল, "দণ্ডে দণ্ডে ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়া রাখে শুধু রক্ত পান লোভে ?"

আমরা যখন দেবী দর্শন করছিলাম তখন দেখি অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণ-বিলাসী অতি ভক্তিভরে ঐ দেবীমূর্তি দর্শন করছেন। আমাদের সরকার পরিচালিত গাইড বেশ ভাল ভাবে আমাদের ওখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখালেন। সেখান থেকে আমাদের দেখান হয়েছিল জয়গড় কেল্লা—শোনা যায় ওখানে নাকি রাজবংশের বহু মূল্যবান হীরা জহরত আছে। রাজারাই নাকি সব সময় সেখানে যেতে পারেন না।

সেখান থেকে রওনা হয়ে আমরা হাওয়া মহল হয়ে পথের দুধারে শ্রেণীবদ্ধ বিপণী শ্রেণী ও সুন্দর সুন্দর বাড়ি, মনে হচ্ছিল যেন নাটকের দৃশ্যাবলী দেখছি, এইভাবে প্রাসাদে এলাম। রাজপথের

দুধারে ফুটপাত। এই রাজপথ দৃঢ় ও সুপ্রশস্ত। এই রাজপ্রসাদ শহরের প্রায় একাংশ জুড়ে আছে। প্যালেসের প্রবেশ পথের দুধারের কত অফিস কত লোকজন। প্যালেসের ভেতরে যে সব অংশে সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে অবশ্য দক্ষিণা দিয়ে সেগুলির বর্ণনা অনেক স্থানে পাওয়া যায়। প্রায় সব রাজপ্রাসাদের বর্ণনা একই রকম কিন্তু বর্ণনার চেয়ে বর্ণনাতীত বিষয়গুলি শুধু উপলব্ধিই করা যায়, বোঝান যায় না। রাজপ্রাসাদকে পাশে রেখে আমরা প্রথমে গেলাম রাজপ্রাসাদের বাগানে গোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে। তখন ভোগের সময় অনেক ভক্ত সবাবেশ হয়েছে। আরতি হচ্ছে। অপূর্ব চিত্তাকর্ষক মনোরম দৃশ্য। গোবিন্দজীর মূর্তির দিকে তাকালে চোখ ফেরান যায় না। পরিবেশটি অতি শান্ত ও সমাহিত। পারিপার্শ্বিক সমস্ত পরিবেশ এমনই মাধুর্যপূর্ণ যে মানুষের মনের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমের উদয় না হয়ে পারে না। ঐ গোবিন্দজীকে কেন্দ্র করে অনেক লেখক অনেক কথাই বলেছেন। গাইডও আমাদের অনেক গল্প শোনাল। জয়সিংহের কন্যার নাকি জন্ম লক্ষ্মীর অংশে সেইজন্য নারায়ণের প্রয়োজন। গোবিন্দজী যখন প্রতিষ্ঠিত হলেন তখন রাজকন্যার নাকি বয়স ১৫।১৬। রাজকন্যা বিবাহ করতে চাইলেন না। রাজা খুবই বিব্রত। এদিকে রাজকন্যার শয্যার পাশে নূপুরের অংশ বা কিছু অলঙ্কার দেখা যায়। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে যেদিন গোবিন্দজীর চাদর দিয়ে রাজা তাঁদের একসঙ্গে নিদ্রিত দেখলেন। সেইদিন রাজকন্যা বুঝতে পারেন যে সবই জানাজানি হয়ে গিয়েছে। তখন কলঙ্কমোচনের জন্য আবেদন করেন গোবিন্দজীর কাছে। গোবিন্দজী তখন তাঁকে শ্রীঅঙ্গে লিপ্ত করে উদ্ধার করেন। শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী তাঁর রাজস্থান পর্বে অবশ্য ঐরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে আমরা গেলাম মান মন্দিরে। শীতের দিন হলেও রৌদ্রের তাপ বেশ তখন অনুভব করছিলাম। আর তার সঙ্গে ছিল পেটের তাপ।

এই কয় ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে শরীর তখন বেশ ক্লান্ত। এই মান মন্দিরের খ্যাতি আছে। এটি একটি প্রাচীন মান মন্দির। এবারে এলাম এলবার্ট মিউজিয়াম বা যাদুঘর। এর ভেতর কি আছে আর কি নেই। রাজস্থানের শিল্প থেকে শুরু করে বর্তমান ও অতীতের রাজার ও ঐ দেশের সব জিনিসই রয়েছে। এই শহরটি এলোমেলো ভাবে যেখানে সেখানে বাড়ি করে গড়ে ওঠেনি। রীতিমত ভাবে পরিকল্পনা অনুসারে এর যে পত্তন হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এর দুধারের বাড়িগুলি দেখলেই। দুধারের বাড়িগুলি একই ধরনের তৈরী। প্রত্যেক বাড়িখানি গোলাপী রং-এর। মোড়ে মোড়ে জলের ফোয়ারা। ছোট একটু বাগান। সুদৃশ্য বিজলী আলোর স্তম্ভ রাস্তার শোভা আরো বৃদ্ধি করেছে। চৌমাথায় চৌমাথায় বাজারের চক্। শৌখীন বাস আমাদের জয়পুর স্টেশনে নিয়ে এল কারণ তার যা দেখাবার শেষ হয়ে গেল। আমরা রিফ্রেসমেণ্ট রুমে আমাদের মধ্যাহ্ন আহার শেষ করে কিছুটা বিশ্রাম নিলাম। এই জয়পুর স্টেশনটি আমার পূর্বে দেখার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু এখন যা দেখলাম তাতে এর সবই বদলে গিয়েছে। সুন্দর শহরকে মিলিয়ে সুন্দর স্টেশনটি তৈরী করা হয়েছে। এখন স্টেশন রিটায়ারিং রুম ছাড়া আরো অনেকগুলি টুরিস্টদের থাকার জায়গা আছে। টুরিস্ট বাংলো, গভর্ণমেন্ট হোস্টেল ও হোটেল আছে।

চা পান শেষ করে আমরা একটি গাড়ি নিয়ে বাজারের দিকে গেলাম বেড়াতে। জয়পুরের পাথরের বাসন ও শাড়ি বিখ্যাত। সবই দেখলাম। পাথরের জিনিসের ওপর অপূর্ব শিল্পীর কাজ। কিনবার জন্য মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। মনকে সংযত করলাম। কিনলাম না কিছুই কারণ আমাদের সামনে এখন অনেক পথ চলার। লট্‌বহর নিয়ে পথে চলা কষ্টকর তো বটেই খোয়া যাওয়ার ও ভেঙে যাওয়ারও ভয় আছে। আমরা রাত্রের আহার একটি ভাল খাবারের দোকানে উঠে সেরে নিলাম।

২৭শে নভেম্বর ভোর ৫॥০ টায় আমেদাবাদ গামী দিল্লী মেল ধরে সকাল ৯টার সময় এলাম আজমীঢ়। গাড়িতে অসম্ভব ভিড় ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। তাতে খুব সুবিধা হল না কারণ ঐ গাড়িতেও খুব ভিড় ছিল। যাহোক কোনমতে বিছানার ওপর বসে কয় ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। রাজস্থানের শীতের ভোর হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। আজমীঢ়ে নেমে সোজা গেলাম রিটায়ারিং রুমে। স্থানও পেয়ে গেলাম। স্নান ও কিছু জলযোগ করে আমরা রওনা হলাম পুষ্করের পথে। আজমীঢ় থেকে পুষ্কর যাওয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা আছে। সেই সঙ্গে কিছু স্টেশন ওয়াগনও ভাড়ায় যাতায়াত করে। আমরা তাতেই দুটি সিট্ সংগ্রহ করে রওনা হলাম। আজমীঢ় থেকে পুষ্করের দূরত্ব হচ্ছে ৭ মাইল। শহরের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলতে লাগল। শহর যখন শেষ হল তখন পাহাড়ের গা দিয়ে গাড়ি উঠতে লাগল ওপরের দিকে। নাগা পাহাড় ডিঙিয়ে গাড়ি গিয়ে পুষ্কর তীর্থে থামল। আজমীঢ় থেকেই পাণ্ডা আমাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের সব দেখালেন। পুষ্কর জলাশয়ে আমাদের পূজা তর্পণও করলেন। এটি একটি আদি তীর্থ কারণ ব্রহ্মা সৃষ্টির মানসে এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। এ ছাড়া অনেক কিংবদন্তী এর সম্বন্ধে আছে। এই পুষ্করের ঘাটের সংখ্যা বহু। এর জলে প্রচুর মাছ আছে। কিছু ছোলা ফেলে দিলে মাছগুলো খাবার জন্য ভেসে ওঠে। আগে জলে অনেক কুমীর ছিল। এখন আর নেই। রাস্তা ঘাট বড় অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। খাবারের দোকানগুলিতে এত মাছি যে কোন কিছু কিনে খাওয়ার প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সাবিত্রী পাহাড়ে উঠব না ঠিকই করেছিলাম। প্রথমে সময় ছিল আমাদের হাতে কম তার পর অতটা পথ পাহাড়ে ওঠা বেশ কষ্টসাধ্য ভেবেই আর এদিকে পা বাড়াইনি। এখানে মন্দিরের অভাব নেই। আমরা ব্রহ্মার মন্দিরে গেলাম। চতুর্মুখ

ব্রহ্মা স্থূলকায় রক্তবর্ণ ও হংসবাহন, বাঁ দিকে গায়ত্রী দেবী ও সাবিত্রী দেবীকে কেন্দ্র করে অনেক প্রাণস্পর্শী গল্প আছে। মন্দিরের ভিতরে অনেক দেবদেবীর মূর্তি দেখা গেল। এখান থেকে বেরিয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে এলাম রঙ্গনাথের মন্দিরে। এটা হয়েছে নূতন। দ্রাবিড় স্থাপত্যের নমুনা দেখা গেল। রাস্তার ধারে বিরাট গোপুর। মন্দিরের দেওয়ালে অসংখ্য পৌরাণিক চিত্র। শোনা যায় এই মন্দির নির্মাণ করতে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সেখানেই একখানা স্টেশন ওয়াগন পেয়ে গেলাম। প্রতিজন দশ আনা করে দিয়ে আজমীঢ়াভিমুখে রওনা হলাম। স্টেশন রিফ্রেসমেণ্ট রুমে আগে থেকেই আমাদের মধ্যাহ্ন ব্যবস্থা ছিল। আহারের ব্যবস্থা দুটি রকম—মাংস ভাত বা নিরামিষ। আমরা নিরামিষের পক্ষপাতী কারণ পথে ঘাটে মাংস খাওয়া সমীচীন নয়। এদের রান্না আমাদের রুচিসম্মত নয় তবে ক্ষুধার সময় আহার তত বাছা ঠিক নয় সেই কারণে কিছুদিন ধরে ঐ খাদ্যকে সুস্বাদু ভেবে খেয়ে যাচ্ছি।

আজমীঢ় হিন্দু ও মুসলমানের তীর্থক্ষেত্র। আজমীঢ় শহরে অনেক কিছু ইতিহাস প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান আছে। আমরা বিকালের দিকে একটি টাঙা নিয়ে গেলাম আড়াতাই রোজ কা জুপড়ি। এর প্রাচীন ইতিহাস অতি সুন্দর। শোনা যায় পূর্বে নাকি এই মসজিদ হিন্দু মন্দির ছিল, শুধু তাই নয়, হিন্দু নৃপতি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদটিকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প আছে। আড়াই দিনের মধ্যে নাকি এর নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে। ধূমপ্রার অনতিদূরে শহরের দক্ষিণ দিকে নৈমুদ্দিন চিস্তের দরগা আছে। এই দরগা মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। হিন্দুরাও এখানে যখন আসেন পূজা দিয়ে থাকেন। এখানে যে অন্ন দানের ব্যবস্থা দেখলাম তাতে মনে হল যে ৭০।৮০ মণ চাউল রান্না করে ভক্তদের মধ্যে বিলি করা হয়। এখনও এইভাবে ভক্তদের

মধ্যে বিলি করা হয়। আমরা যেদিন দরগা দর্শন করতে গিয়েছিলাম সেদিন সেখানে খুব হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। কারণ পাকিস্তানের কোন একজন সম্মানীয় অতিথি এসেছেন তীর্থস্থান দর্শন করবার জন্য। রাস্তার ধারের গেট থেকে ভেতর পর্যন্ত গেলে মনে হয় অতি প্রাচীন এই দরগা।

এখানে শুধু যে হিন্দু ও মুসলমানের কীর্তি আছে তা নয়। জৈন এখানে অনেক বাস করেন। এখানে জৈনদের লাল মন্দির আছে, যাকে বলা হয় নাসিয়ানা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে দেখা যাবে মন্দিরের বিচিত্র রং-এর কাঁচের বাহার। জৈন মন্দিরের কারুকার্য অপূর্ব। সেখান থেকে আমরা এলাম "আনা সাগর।" শহরের পশ্চিমাংশে এই বৃহৎ হ্রদ বিরাজিত। হ্রদের চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আপনাতে আপনি বিকশিত। আমরা এবার ফিরে এলাম স্টেশনে। স্টেশনের আশেপাশে অনেক দোকান পাট আছে। ভাল ভাল খাবারের দোকানও আছে। খাদ্যের মধ্যে এখানকার রাবড়ি অতি সুস্বাদু। দু'চারটি দোকান ঘুরে কার দোকানের খাবার ভাল অনুসন্ধান করে কিছু পুরী ও রাবড়ি কিনে নিয়ে রিটায়ারিং রুমে ফিরে এলাম।

এসে আলাপ হল একটি পরিবারের সঙ্গে তাঁরাও বাঙালী ; যাবেন চিতোর। রাত্রের গাড়ি ধরবেন বার্থ তাঁদের রিজার্ভ করা হয়ে গিয়েছে বললেন। আমরাও ঐ গাড়িরই যাত্রী তবে আমাদের টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর। আমরা কিছুক্ষণ পর রাত্রের আহার কিনে আনা খাবার দিয়ে সেরে নিলাম।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর যদি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সর্বদাই মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক দেখা যায় যে গাড়ি এলে স্থান পাব না। সেটা আমাদের সর্বদাই হত। আমরা রাত্রের গাড়িতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিতোর রওনা হলাম। আমাদের গাড়ি রাত্রি ১০-৫০ মিঃ, ভোর ৩ টায় গাড়ি পৌঁছাবে চিতোর।

গাড়িতে যে স্থানাভাবের ভয় করেছিলাম সে ভয়ের হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল স্থানায় কুলী। গাড়িটি প্ল্যাটফর্মে লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য ছুটি নিচেকার বেঞ্চ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আমরা ১-শে নভেম্বর প্রাতে চিতোর পৌঁছে বিশ্রামাগারে স্থান নিলাম। আমাদের আজমীঢ়ের সেই পরিচিত বাঙালী পরিবারটি দেখি ততক্ষণ এসে বিশ্রামাগারে স্থান নিয়েছেন। এখানে রিটায়রিং রুমও আছে। আমরা কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকব সেই জন্য আর কোথাও গেলাম না। প্রাতঃকৃত্য সেরে মালপত্রগুলো সব লেফ্ট লগেজে রেখে একটি টাঙা নিয়ে বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ও তাঁর পত্নীসহ আমরা চিতোরগড়ের দিকে রওনা হলাম। চিতোর স্টেশন থেকে চিতোরগড়ের দূরত্ব ৩।৮ মাইল হবে। স্টেশন থেকে এই ভগ্ন দুর্গের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম—এই সেই চিতোর—যার বীর-গাথা শুনে আসছি। এই চিতোরের বীরগণের আত্মবিসর্জন কাহিনী সমস্ত জগৎ আজ পর্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে শোনে। সেই চিতোরের পাদপীঠে আমরা উপস্থিত। আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলতে লাগল। গাড়িতে সহযাত্রীদের নিয়ে আমরা চারজন। একটি বড় পুল পার হয়ে পাহাড়ের ওপর গাড়ি উঠতে লাগল। নয়নের দৃষ্টি যদিও সামনের দুর্গের দিকে মনের দৃষ্টি ছুটে চলেছে সেই ইতিহাসের পাতায়। এই তো সেই দিন যে দিন রাজপুত বীরগণ দিল্লীর সম্রাটগণকে নিজ বীরত্বে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন। মনে হয় ভুবনমোহিনী পদ্মিনীর কথা যার রূপ ও সৌন্দর্যের প্রলোভনে সম্রাট আলাউদ্দীন নিজের সত্তা ভুলে গিয়েছিলেন। মনে হল সেই ভক্তি ও প্রেমের উদ্গাতা মীরাবাঈএর কথা। এই মাটিতেই জন্মেছিলেন কত বীর, কত বীরাঙ্গনা, কত চারণ, যাদের জীবন গাথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ, এই সেই দেশপ্রেমিক রানাপ্রতাপের জন্মভূমি। চিতোরগড়ে পৌঁছতে ৭টি সুদৃঢ় দ্বার অতিক্রম করতে হয়। পটল পোল, ভৈরব পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল,

জরলা পোল, লক্ষ্মণ পোল ও রাম পোল। রাজপুতগণ সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের বংশধর এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। ইতিহাস বলেন ৭২৮-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বীর শ্রেষ্ঠ বাপ্পারাও এই দুর্গটি নির্মাণ করেন। তারপর ৫০০ বৎসরের ইতিহাস খুব পরিষ্কার নয়। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর ধ্বংস করেন। এর কয়েক বৎসর পর শিশোদীয় সর্দার হামিরের শাখা চিতোর উদ্ধার করেন।

ভগ্নস্তূপ শ্মশানের মত এখানে অনেক দর্শনীয় প্রাচীন স্থান পড়ে আছে। রানা কুম্ভের স্তম্ভ। রানা কুম্ভের মহল। গিরিধারীলাল, ভক্ত মীরাবাঈ এর স্মৃতি বিজড়িত ধূলিকণা সেখানে রয়েছে, আর রয়েছে মন্দির। রানার সঙ্গে মীরাবাঈ-এর অনেক বিষয় মত-বিরোধ হয়েছিল। মীরা চেয়েছিলেন সবার মধ্যে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে. রানার ছিল তাতে আপত্তি। রানা পরে মত দিলেন, শুধু মতই দিলেন না মন্দির নির্মাণ করে মীরার মানস-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। আজ আছে সেখানে একটি মাত্র ছবি। সব গেলেও মীরা ও তাঁর ভজন—ভক্তি ও প্রেম নিয়ে আজও আমাদের মধ্যে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত।

জয়স্তম্ভ দেখলাম। রানা কুম্ভের কীর্তি। সুন্দর স্থাপত্য রুচির পরিচায়ক। উপরে ওঠা যায়। আমরা অবশ্য সে চেষ্টা করিনি। চিতোর দুর্গে আছে জৈন কীর্তি। এগুলি একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর নিদর্শন স্বরূপ আজও প্রমাণ দিচ্ছে। শিব মন্দির, কালিকামাতার মন্দির। কালীর পাশে দুর্গার মূর্তিও আছে। এরাও শৈব। একলিঙ্গ শিবের দেওয়ান হিসাবে মেবার শাসন করতেন। এঁদেরই বংশে মীরাবাঈ এলেন বধূ রূপে। যিনি ভক্তি প্রেম দিয়ে ভগবানকে পাবার ব্যাকুল বাসনাকে ভজনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে আজ সর্বজনপূজ্য। আমরা শ্রীচৈতন্য দেশের মানুষ। আমাদের প্রেমের ঠাকুরও মাতিয়ে চলেছিলেন এই ভক্তি,

ও প্রেমের বাণীতে। সেই জন্য আমরা প্রেম ও ভক্তিতে সহজেই আকৃষ্ট হই। এই কারণেই মীরার কাহিনী আমাদের মনের মধ্যে বেশী করে আলোড়িত হচ্ছিল। শক্তি ও প্রেম ধর্মের দ্বিধারা এই চিতোরের মাটিকে ধন্য করেছে।

টাঙা আমাদের নামিয়ে দিয়েছিল ; আবার আমরা টাঙা করে গেলাম পদ্মিনী মহল। ছোট জলাশয়ের মধ্যে একটি বাড়ি। আমরা যে স্থান থেকে পদ্মিনী মহল দেখলাম সেখানে খানকয়েক আয়না আছে। এই আয়নায় নাকি পদ্মিনীর রূপ দেখে পাগল হয়েছিলেন দিল্লীর বাদশা আলাউদ্দিন খিলজি। আজ অনেকে প্রশ্ন করছেন যে পদ্মিনী বলে কেহ ছিলেন কি ? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার কাজ নয়। সেই কারণে আমি বিরত হলাম। ফেরার পথে আমরা এলাম সেখানে।

যেখানে একদিন রাজপুত রমণী সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। এখানে একজন ছোট জমিদার আছে, আর আছে পাহাড়ের অঙ্গ থেকে নিরত স্ফটিক ধারা সদৃশ জলধারা। সেই জলধারা মন্দিরের মধ্যে যে মহাদেব আছেন তাঁকে নিরত ধারায় স্নান করাচ্ছে। সামনেই জলপূর্ণ একটি পুষ্করিণী। অনেকেই সেখানে স্নান করছেন। শুনলাম যে এর দক্ষিণে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। রাজকুমারীগণ এই পথে শিবপূজা ও নিত্য স্নান করতেন।

আলাউদ্দিন খিলজি যখন চিতোর জয় করেন তখন রণক্ষেত্রে বীর যোদ্ধাগণ আত্মবিসর্জন করলেন এবং বীরাঙ্গনা রাজপুত রমণী-গণ দলবদ্ধ হয়ে জ্বলন্ত চিতায় এইখানেই "জহর ব্রত" পালন করেন। এই বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বহু শতাব্দী ধরে যে অগণন বীরত্ব আর "জহর ব্রতের" স্মৃতি বহন করে আসছে অনেকের কাছে তা রূপকথা হতে পারে কিন্তু এই বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেম জাতীয়তা বোধের পথ-প্রদর্শক সন্দেহ নেই। ভারতগৌরব চিতোর, তোমায় তোমার বীরত্বের জন্য প্রণাম জানাই।

আমরা ফিরে এলাম স্টেশনে তখন বেলা প্রায় ১টা বাজে। রিফ্রেসমেণ্ট রুমে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে মালপত্র সব লেফট লগেজ থেকে নিয়ে ৩।১৫ মিঃ. এর ট্রেন ধরে আমরা রওনা হলাম উদয়পুরের দিকে। আমাদের সাথী অন্য পথে রওনা হয়ে গেলেন।

আমর সন্ধ্যা ৭।১৫ সময় উদয়পুর পৌঁছালাম। উদয়পুরে টুরিস্টদের থাকার জন্য হোটেল ছাড়াও অন্য ব্যবস্থা আছে, আমরা টুরিস্ট বাংলোতে গিয়ে উঠলাম। দোতালায় একখানা ঘর পেলাম। ঘরগুলি বেশ বড়। দৈনিক ৩॥০ টাকা করে এদের চার্জ। ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার। তার জন্য বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্টেশন থেকে প্রায় ২॥০ মাইল পথ এর দূরত্ব। এটি সরকার নূতন করেছেন। পরিবেশটি খুব নির্জন। এখান থেকে দূরের উদয়পুর শহরটার অনেকটা দেখা যায়। সবদিক দিয়ে তো ভাল কিন্তু আহারের কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। সংবাদ নিয়ে জানলাম নূতন তৈরী হয়েছে এখনও খাওয়ার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। শীঘ্রই নাকি সে ব্যবস্থা হবে। তবে সকালে চা ডিম পাঁউরুটি পাওয়া যায়। আমরা সেদিনকার মত রাত্রে ঐ রকম কিছু আহার করে শয্যায় আশ্রয় নিলাম, শরীর ছিল ক্লান্ত। নিদ্রার জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করেই নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে সমস্ত রাত কাটিয়ে দিলাম। হঠাৎ দরজার ঠক্ ঠক্ শব্দ, দরজা খুলে দেখি বেয়ারা চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মনের আনন্দে চা পর্ব শেষ করে প্রস্তুত হতে লাগলাম দর্শনীয় স্থান দেখবার জন্য। গাইড একজন এসে গেল। টাঙাও ঠিক হয়ে গেল। সমস্ত জায়গা দেখিয়ে আনবে দক্ষিণা মাত্র ৫৲ টাকা।

টুরিস্ট বাংলো থেকে প্রথমে আমরা গেলাম সালিয়ান কিব়াদি। রানা ফতেসিং-এর তৈরী। বড় বড় গাছে ঢাকা সুন্দর স্থান চারিদিকে, বহু রং এর ফুল ফুটে জায়গাটাকে আলো করে রেখেছে।

এখানে ফোয়ারা আছে অনেক। কিছু দক্ষিণা দিলে ফোয়ারা থেকে জলোৎক্ষেপ দেখা যায়। আমরা যখন সেখানে গিয়েছি সেই সময় আরো একটি দলও গিয়েছেন দেখতে। দুই দলে মিলে দক্ষিণা দিলাম খরচ হল কম কিন্তু উপভোগ করলাম অপূর্ব সৌন্দর্য যা চিরকাল মনে থাকবে। যখন সমস্ত ফোয়ারাগুলি খুলে দিল তখন তার দৃশ্য এত মনোরম যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সেখান থেকে আমরা এলাম রাজপ্রাসাদে. গাইড একটি প্রস্তর দেখিয়ে বললে যে উদয়সিং যখন চিতোর থেকে পরাজিত হয়ে এখানে আসেন তখন এই স্থানটিতে একজন সন্ন্যাসী বসে ছিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত উদয়সিং বনে বনে ঘুরে নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করছেন। সন্ন্যাসী তাঁকে বলেন, "তুমি এখানে রাজত্ব কর। সমস্ত হৃত গৌরব ফিরে পাবে।" সেই কথা মতই নাকি উদয়সিং এখানে রাজত্ব করেন। উদয়পুর শহরটি প্রাচীন নয় মাত্র ৪০০ বৎসরের। রাজপ্রাসাদের অনেকটাই এখন ভারত সরকারের হাতে। একটা মহল পেরিয়ে আমরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মহল আছে। রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন মহলে কারুকার্যগুলি অতি মনোরম। রাজপ্রাসাদের সমস্ত মহল কটি দেখে আমরা এলাম একটি বিরাট হ্রদের সামনে তাকে বলা হয় পিছ্‌লা হ্রদ। অপূর্ব তার দৃশ্য। ঐ লেকের নীল জল পাহাড়ের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে অনেকগুলি নৌকা আছে। যাত্রীদের নিয়ে যাবে লেক প্যালেসে। যন্ত্র চালিত নৌকাও আছে। তার ভাড়া বেশী আর তাতে যেতে হলে পূর্বে থেকে ব্যবস্থা করতে হয়। আমরা সামান্য কিছু ভাড়া দিয়ে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নৌকায় উঠে বসলাম। এই জলবিহার অতীব মনোরম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা এসে লাগল সেই লেক প্যালেসের ঘাটে। চারিধারে জল, মধ্যে অপূর্ব একটি প্রাসাদ। এর ভেতর বেলজিয়াম কাঁচের খাট পালঙ্ক, চেয়ার টেবিল থেকে

শুরু করে ভাল ভাল ছবি আরো কত কি এখানে আছে। সুখ-বৈভব উপভোগ করবার সমস্ত ব্যবস্থাই এখানে আছে। উদয়পুর যে হ্রদ প্রসিদ্ধ স্থান তা না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না।

রাজবাড়ি থেকে আমরা এলাম জগদীশ মন্দির। এটি বিষ্ণুর মন্দির। প্রাঙ্গণের চারকোণে ছোট ছোট অনেক কটি মন্দির আছে। দেবতা হলেন শিব শক্তি সূর্য গণেশ। দর্শন পর্ব শেষ করে আমরা বাজারের ভেতর দিয়ে চলে এলাম ফতে সাগর। উদয়পুরে যেমন আছে লেক বা হ্রদ তেমনি আছে কয়টি পোল হাতি কিষাণ সূর্য আর ব্রহ্মা পোল। গাড়ি যখন ফতে সাগরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন মনে হল যে এর সৌন্দর্যই শুধু মনোরম নয়, এর উপকারিতা আছে অনেক। রাজসরকারের বড় বড় গেস্ট হাউস ও হোটেল এখানে আছে। রানা ফতে সিংএর তৈরী বলে এর নাম ফতে সাগর। সেখান থেকে আমরা মিউজিয়ম ও জু দেখে ফিরে এলাম বাজারে। আগেই বলেছি যে টুরিস্ট বাংলোতে আহারাদির কোন ব্যবস্থা নেই। সেইজন্য এখানে যে একটি কফি হাউস আছে সেখানে সকল রকম আহারের ব্যবস্থা আছে। সেইখানেই আমরা মধ্যাহ্নের আহার করে নিলাম। অনেক দিন পর মাছ ভাত খেয়ে বেশ ভালই লাগল। রান্না অবশ্য আমাদের রুচির মতন নয় তবুও মাছ ভাত, বাঙালীর কাছে নিশ্চয় ভাল লাগবে। কিছুক্ষণ বাজার ঘুরে আমরা ফিরে এলাম টুরিস্ট বাংলোতে। এসে দেখি কয়জন বাঙালী পরিবার এসেছেন আমাদের মতন বেড়াতে। তাঁদের সঙ্গে বেশ আলাপ অলোচনা হল। বৈকালের দিকে সিট্ সংরক্ষণের জন্য স্টেশনে একবার গেলাম। পরের দিন ৩০শে নভেম্বর বিকেল ৪-৪ মিঃ এর গাড়িতে দুটি সিট্ সংরক্ষণ করে নিলাম। এখান থেকে একটি বগি জুড়ে দেয় যেটা বরাবর আবু রোড স্টেশন হয়ে আমেদাবাদ যায়। ফেরার পথে দেখতে এলাম উদয়পুরের উন্নয়নের কাজ। কৃষি কলেজ, শিল্প কলেজ, বিজ্ঞানের

কলেজ তার সঙ্গে হোস্টেল। আলোচনা করে জানলাম যে উদয়পুরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনেক কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। উদয়পুরের রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার, বেশীর ভাগ স্থানের রাস্তাগুলি চওড়া। গিন্নী কিছু কেনাকাটা করবেন বলে জেদ ধরেছেন। টাঙাওয়ালা নিয়ে গেল দোকানে। কাঠের খেলনা অনেক প্রকার দেখলাম। কেনাও হল কিছু। উদয়পুর থেকে নাথদ্বার রেলগাড়িতে যাওয়া যায় আবার বাসেও যাওয়া যায়। নাথদ্বার স্টেশনে নামলেও ৭ মাইল পথ বাসে যেতে হয়। এইভাবে যাওয়া অনেক হাঙ্গামা। আমাদের টিকিটে নাথদ্বার ছিল।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য আমরা উদয়পুর থেকে বাসে নাথদ্বার যাওয়া ঠিক করলাম। পরের দিন ৩০শে নভেম্বর সকাল ৭টার বাসে আমরা নাথদ্বার রওনা হলাম। বাসে উদয়পুর থেকে নাথদ্বার ৩০ মাইল পথ। পথে ১৪ মাইলের মধ্যে কৈলাসপুরী গ্রাম পড়ে, সেখানে রাজস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একলিঙ্গজীর মন্দির আছে। নাথদ্বার যাওয়ার পথে আমাদের একলিঙ্গজী দেখা হল না। ফেরার পথে গাড়ি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে সেই সময় দেখা যাবে বলে বরাবর আমরা নাথদ্বার গেলাম। নাথদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। আমরা যখন সেখানে পৌঁছালাম তখন শ্রীনাথজীর আরতি ও পূজা হচ্ছিল। আমরা সেই নয়নমুগ্ধকর মূর্তি অবলোকন করে নিজেদের ধন্য করলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে একলিঙ্গজীর সাদা মার্বেল পাথরের সুন্দর মন্দির ও কালো পাথরের চতুর্মুখ শিবমূর্তি দর্শন করলাম। এই সারা পথটিও অতি মনোরম। পাহাড়ের গা দিয়ে চলেছে। এর ধারেই হলদীঘাটের রণক্ষেত্র ও চৈতক ঘোড়ার স্মৃতি। চিতোর থেকে উদয়পুর পর্যন্ত বাসও যাতায়াত করে। আমরা যখন উদয়পুর ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় ১২টা। আহারাদি শেষ করে ফিরে এলাম টুরিস্ট বাংলোতে। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে টুরিস্ট বাংলোর হিসাবমত টাকা মিটিয়ে

দিয়ে বেলা আন্দাজ ৪টার সময় এলাম উদয়পুর স্টেশনে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আমাদের দুটি সিট আগে থেকেই সংরক্ষণ করা ছিল ভেবেছিলাম শান্তিতে যাব। হা হতোস্মি! তা আর হল না। যাত্রীদের চেয়ে তাদের মালপত্রে বাসখানি গেল বোঝাই হয়ে। সেখানে স্থান ভালভাবে না পেয়ে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে টিকিট পরিবর্তন করে উঠলাম। রাত্রে শয়নের কষ্টও বিশেষ হয় নি। চার পাঁচজন শৌখীন যাত্রী সে বগিতে ছিলেন। তাঁরা সকলেই দ্রুতগামী যাত্রী। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। মালভি স্টেশনে রিফ্রেসমেণ্ট রুম আছে। সেখানে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা ভালই হল।

আমরা ১লা ডিসেম্বর ভোর বেলায় এসে নামলাম আবু রোডে। বিশ্রামাগারে আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে চায়ের সঙ্গে কিছু খেয়ে নিয়ে আবু পাহাড়ের দিকে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রথম বাসটা ধরতে পারলেই ভাল হয় এই কথা ভাবছি এমন সময় একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি সরকারী কর্মচারী, যাবেন মাউণ্ট আবু। তিনি তাঁর নিজের জন্য বাসের টিকিট কাটতে যাচ্ছেন, তাঁকে অনুরোধ করে বললাম যে দয়া করে আমাদের জন্য দুইখানি টিকিট যদি কেটে আনেন। তিনি আমাদের টাকা নিয়ে গিয়ে দুখানি সংরক্ষিত আসনসহ বাসের টিকিট কিনে আনলেন। যাওয়ার সময় এখান থেকে টোল লাগে টিকিটের সঙ্গেই সেই টাকা তারা নিয়ে নেয়। শীতের আমেজ বেশ অনুভব করলাম। ভাবলাম এইখানে এত শীত না জানি পাহাড়ে কত হবে। মালপত্র নিয়ে বাস ছাড়ার জায়গায় গিয়ে দেখি বেশ ভিড়; স্থান আগে থেকেই সংরক্ষিত ছিল তাই আমাদের কোন অসুবিধা হল না। সমতল পথে কিছুটা গিয়ে পাহাড় হল শুরু। আরাবল্লীর একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়। অন্য সব পাহাড়া শহরের মতন পাহাড়ের গা দিয়ে উঠতে লাগল

ওপরে। বাসগুলি ভাল। সমস্ত কাঁচের জানালা আঁটা। বাহিরের দৃশ্য বেশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগছে না। গিন্নীর মুখে কথা নেই, তিনি নব অরুণোদয়ের দৃশ্য তন্ময় হয়ে উপভোগ করছেন। আবু পাহাড়ের উচ্চতা হচ্ছে প্রায় ৪৫০০ ফুট। রেল লাইন থেকে এর দূরত্ব ১৭ মাইল। ঘণ্টা দুয়েকের আগেই আমরা আবু পাহাড়ের বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। এখন বাসস্থানের সমস্যা। হোটেলওয়ালারা কাছে এসে তাদের হোটেলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। দুই একটি গুজরাটী হোটেল দেখলাম। পছন্দ হল না। এখানে এ-ক্লাস হোটেল দুটি আছে। একটি হোটেল যোধপুর, অন্যটি মাউণ্ট হোটেল। এই হোটেল দুটি বাস স্ট্যাণ্ড থেকে কিছুটা দূরে। বাস স্ট্যাণ্ডের উপরেও থাকবার জায়গা আছে। আমরা হোটেল যোধপুরে আস্তানা নিলাম। হোটেলের বাড়িটা শুনলাম যোধপুর রাজার। এখানে অনেক রাজাদের বড় বড় বাড়ি আছে। এই হোটেলের আঙ্গিনায় সুন্দর ফুলের বাগান। নব প্রস্ফুটিত ফুল সমস্ত হোটেলটিকে আলো করে রেখেছে। ঘরগুলি প্রশস্ত ও সুন্দর। দেখে শুনে মনে হল দক্ষিণা বোধ হয় বেশী হবে। ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানলাম যে দুজনার দৈনিক ২০৲ টাকা করে লাগবে। কারণ এখন "off season". তথাস্তু! রাজী হয়ে গেলাম। বিছানা আমাদের আর খুলতে হল না। ঘরের মধ্যে দুগ্ধফেননিভশয্যা পরিষ্কার উৎকৃষ্ট কম্বল দিয়ে ঢাকা। মেঝেতে দামি গালিচা পাতা ও ঘরের মধ্যে অনেক আসবাবপত্র আছে। ইংরেজী কায়দায় হোটেল। প্রাতরাশটা বেশ ভালভাবেই হল। উত্তম করে গরম জলে স্নান করে রোদে পিঠ দিয়ে বসে কয়খানি চিঠি লেখার কাজ সেরে নিলাম। এতবড় হোটেল যেখানে প্রায় ৭০।৮০ জন লোক থাকতে পারে সেখানে কেবলমাত্র আমরা দুটি প্রাণী। কিছুক্ষণ পর বেশ অনুভব করলাম ক্ষুধার উদ্রেক। মনে হল জল তো

ভাল এর মধ্যেই সব হজম করে দিয়েছে। বেলা একটার সময় মধ্যাহ্ন আহারের ঘণ্টা বাজল; আমরা খানা ঘরে গিয়ে আহার শেষ করে নিলাম। তারপর রওনা হলাম দিলওয়াবা মন্দিরের দিকে। এই সারা পথটা হেঁটেই গেলাম। আমাদের হোটেলের সামনে পুলিস ট্রেনিং কলেজ, এখানে সব আই. পি. এস'দের শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেকেই শিক্ষা গ্রহণ করছেন দেখলাম। সেখান থেকে গেলাম মাউণ্ট হোটেলে। সেখানে একদল সহ-পথযাত্রীর সঙ্গে দেখা হল, যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল উদয়পুরে। এই হোটেলটিও বেশ আধুনিকতম সাজসরঞ্জামে সজ্জিত তবে বাড়িটা ছোট। এখানেও off season বলে দক্ষিণা কম। পাহাড়ে যেতে গেলে off season-এই যাওয়া ভাল। সস্তায় ভাল থাকা যায় আর তারা আদর যত্নও করে বেশি। আমরা পথের দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলে এলাম দিলওয়ারের মন্দিরে। পথ বেশ অনেকটা। আগে জানলে নিশ্চয়ই হেঁটে এতটা পথ আসতাম না। পাহাড়ের পথ কিছুটা চলে বিশ্রাম করলেই আবার চলার শক্তি নূতন করে পাওয়া যায় সেই ভরসাতেই একটানা চলে এসেছি এতটা পথ।

মন্দিরের ভেতরের রূপ, সৌন্দর্য, শিল্প ও জাঁকজমক বাইর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। এই জৈন মন্দির বহু প্রাচীন। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এখন দেখলাম শিল্পীর নয়নমুগ্ধকর নিঁখুত কাজ। ভাবলাম অতীত ভারতে এমন সব শিল্পী ছিল যাদের জন্য আমরা আজও গৌরব বোধ করতে পারি। শিল্পীর হাতের কাজ এত সুন্দর যে যন্ত্রকে হার মানিয়ে দেয়। ইতিহাস নাকি বলে এটা একাদশ শতাব্দীর ঘটনা। এই মন্দিরের প্রস্তুতকারক হচ্ছেন বিমল শাহ। মন্দিরের ঠাকুর হলেন জৈন তীর্থঙ্কর। মহাবীর পালের মন্দিরের পাশে আছে হাতিশালা আর তার সামনেই দেখলাম ঘোড়ায় চড়া বিমল শাহের মর্মর মূর্তি।

এখান থেকে কিছুটা দূরে আর একটি দর্শনীয় স্থান আছে তাকে বলে 'অচল গড়'। সেখানে কুমার পালের তৈরী জৈন মন্দির আর রানা কুম্ভের ভাঙা প্রাসাদ আছে। এই 'অচল গড়' ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। আরও অনেক দেখার জিনিস এখানে আছে। আমাদের সব দেখা হল না কারণ শরীর এখন বড় ক্লান্ত। ফেরার গাড়ি সব সময় পাওয়া যায় না। সামনেই পেলাম একখানা ট্যাক্সি। আমরা ফেরার পথে নীক লেক্ ও সানসেট পয়েন্ট দেখে ফিরে এলাম আমাদের হোটেলে। একটু বিশ্রাম করে বেশ কড়া করে দু পেয়ালা চা পান করে বাজার দেখতে গেলাম। বাজারে বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হল না। এখন টুরিস্টের সংখ্যা অনেক কম সেইজন্য বাজারের জমজমা সে রকম নেই। সূর্যদেব তখন একেবারে ঢলে পড়েছেন। শীত তখন বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। বাহিরে থাকা আর ঠিক নয় ভেবে ফিরে এলাম হোটেলে। এসে "ফায়ার প্লেসে" আগুন জ্বালিয়ে বেশ আরাম করে বসে রাত্রের আহারের সময় পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। মাঝে অবশ্য বেশ ভাল কফি দিয়ে গিয়েছিল হোটেলের বেয়ারা। স্ত্রী কফি পান করেন না তাঁর জন্য চা এসেছিল। হোটেলের ঘরটি এতক্ষণ বেশ গরম হয়ে উঠেছে। এই সময় আবার খাওয়ার ঘণ্টা। খানা ঘরে গেলাম। বললাম এখন মাত্র পাঁচটা, এর মধ্যেই রাত্রের আহার শেষ করে নেব। বেয়ারা বললে আমাদের রাত্রে চলে যেতে হবে, শীতের রাত্রি, বেশী রাত হলে আমাদের খুবই কষ্ট হয়। আপনারা মাত্র দুজন, খাওয়া শেষ করে নিলেই আমাদের ছুটি। বেয়ারাদের কষ্টের কথা ভেবে আমরা রাত্রের আহার সেরে নিলাম। যখন ঘরে এলাম তখন আগুন জ্বলছে। কিছুক্ষণ এটা ওটা করে শুয়ে পড়লাম। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল অন্য কোন কারণ নয় শীতের তীব্রতা এত বেশী যে বিছানায় শুয়ে থাকা আর যাচ্ছে না। আলো জ্বেলে দেখি আগুন নিভে গিয়েছে। আবার আগুনটা ঠিক করে

দিলাম। এ কাজ আমাদের জানা নেই। কোন দিনই এ কাজ আমাদের দেশে করতে হয় না, সেই জন্য ঠিক না হলেও কিছুটা হল। কোনরকমে রাতের শেষ দিকটা কাটিয়ে দিলাম। ঠিক সময় মত দেখি প্রাতে চা দরজায় এসে হানা দিচ্ছে। দরজা খুলে দিলাম। চা এসে গেল, ধূমায়িত চা শীতের দেশে ভোরের কন্‌কনানিতে কিছুটা কমিয়ে দিল। তার কিছুক্ষণ পর এল স্নানের ঘরে গরম জল। সকালের সব পর্ব শেষ করে, জিনিসপত্র সবগুলো গুছিয়ে নিয়ে প্রাতরাশের জন্য খানা ঘরে গেলাম। আমাদের বাস ছাড়বে ৮॥০ টার পর। মালপত্র হোটেলের ম্যানেজারবাবু লোক দিয়ে আগে থেকেই বাস স্ট্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাসের টিকিট কাটার জন্য লোকও পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতএব তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন আমাদের নেই। নিশ্চিন্ত মনে ধীরে সুস্থে সকালের আহারটি শেষ করে হোটেলের দেনা-পাওনা চুকিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে চলে এলাম। এসে দেখি টিকিট ঘরে কিউ। আমাদের জন্য যে লোকটি টিকিট কাটবে সে অনেক দূরে। গাড়ি ছাড়ার সময় হাতে কম আছে। আমি প্রমাদ গুণলাম। এখন উপায়। যদি টিকিট না পাই তাহলে আজ আর যাওয়া হবে না। তখন নিজে টিকিট ঘরে গিয়ে টিকিট যিনি বিক্রী করছিলেন তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করে বললাম, আমরা টুরিস্ট, আমাদের যদি কিছুটা সুবিধা করে টিকিটটা দেন তো বিশেষ উপকার হয়। খানিক পরে আমরা টিকিট পেয়ে গেলাম। এখানে সব সময় আগে থেকে টিকিট কেটে সিট সংরক্ষণ করে রাখা ভাল তা না হলে আপনি কিউতে দাঁড়িয়ে আছেন, কিছুক্ষণ পর দেখলেন আপনার আগের লোকটিকে টিকিট দিয়ে টিকিট দেওয়া বন্ধ করেছে। কারণ সিট আর নাই।

আমরা পাহাড় ডিঙিয়ে ফিরে এলাম আবু রোডে। এইখানে আমাদের রাজস্থানের দেশগুলো দেখা শেষ হল। আমাদের

নন কনডাক্টেড টুর টিকিটের মধ্যে যোধপুর ও বিকানীর ছিল কিন্তু নানা কারণে আমাদের আর ঐ দিকে যাওয়াহল না।

আমরা আবু রোড থেকে বেলা ১২-৪০ মিঃ-এ জনতা এক্সপ্রেস ধরে আমেদাবাদের দিকে রওনা হলাম। আমাদের টিকিট আবু রোডের পর দ্বারকাধামের ছিল। দ্বারকাধাম যেতে হলে মেসেনা থেকে গাড়ি বদল করে যেতে হয়, আমরা কিন্তু এখন যাব আমেদাবাদ কারণ সেখানে কয়দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হব দ্বারকার পথে। এখন আমাদের টিকিট কিনতে হবে মেসেনা থেকে আমেদাবাদ পর্যন্ত, গাড়ি মেসেনা স্টেশনে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। এই সময়ের মধ্যেই টিকিট কেনা সম্ভব হবে না ভেবে টিকিট কালেক্টারের নিকট অনুরোধ জানালাম যে, আমাদের দুইখানা আমেদাবাদের টিকিট দেবার জন্য। উত্তরে প্রথমে তিনি জানালেন যে, টিকিট আপনার কিনে নিতে হবে। আমি পুনরায় তাঁকে আমার অসুবিধার কথা জানিয়ে বললাম যে, আপনি টিকিট কিনে এনে দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে আমার পক্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে টিকিট কিনে আনা তো সম্ভব হবে না। তিনি বললেন, তবে টাকা দিন দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি। আমার সাহস বেড়ে যাওয়ায় আর একটি অনুরোধ তাঁকে করেছিলাম—সেটি চায়ের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি ভদ্রলোক আসছেন এবং সঙ্গে চায়ের ট্রে নিয়ে একটি বেয়ারাও আসছে। টিকিট কালেক্টার মহাশয় এসে বললেন, এই নিন আপনার টিকিট। টিকিট নিলাম এবং অশেষ ধন্যবাদও তাঁকে দিলাম। বেয়ারাও চায়ের ট্রেটি নামিয়ে রাখল বেঞ্চের উপর, এরকম সুন্দর অমায়িক ব্যবহার অবশ্য এ লাইনে অনেক জায়গায় পেয়েছি এবং আরও পাওয়ার আশা নিয়ে পথ চলছি। টিকিট ও তার সঙ্গে ধূমায়িত চা পেয়ে মনের স্বাভাবিক রূপটা ফিরে এল। নিশ্চিন্তে দু এক চুমুক চা পান করে মনে হল

শরীর প্রাণটা ফিরে এল। এ দিকে ক্রমশই বেশ গরম অনুভব করতে লাগলাম। গাড়িতেও বেশ ভিড় হয়ে পড়েছে। আমাদের মালপত্রগুলো ঠিক করে রাখতে দেখি প্রায় আমেদাবাদ এসে পৌঁছেছি। গাড়ি সে দিন প্রায় ঠিক সময় স্টেশনে প্রবেশ করল। আমরা যার অতিথি হব—সেই ডাঃ চক্রবর্তী আমাদের নিকটতম আত্মীয়, কাঁকরিয়া রেলওয়ে ডিস্পেন্সারীর অন্যতম চিকিৎসক, স্বয়ং এসেছেন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে দেখে বেশ আনন্দ অনুভব করলাম। তিনি নিজেই মালপত্র ঠিক করে কুলির মাথায় তুলে একেবারে ট্যাক্সির কাছে আমাদের নিয়ে এলেন। আমরা ট্যাক্সিতে চেপে এলাম তাঁর বাসায় গত উনিশ শো আঠাশ সালে একবার এসেছিলাম এই শহরে, এখন দেখলাম এর অনেক উন্নতি হয়েছে। এই উন্নতি ও পরিবর্তনে চমৎকৃত হলাম। যাঁরা বাংলার বাহিরে বহুদূরে থাকেন, তাঁরা যখন তাঁদের আত্মীয় স্বজনকে দেখতে পান তখন যে তাঁদের কি আনন্দ হয় বা যারা অনেকদিন পথ চলার পর নিজ আত্মীয় দর্শন পান—এই উভয়ের আনন্দের যে সত্যিকার রূপ, সেদিন কিছুটা অনুভব করেছিলাম।

অনেকদিন পর বাংলার সুগৃহিণীর হাতের মাছের ঝোল আর ভাত তৃপ্তি সহকারে আহার করলাম। অনেক রাত পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে জমে থাকা অনেক কথা আদান-প্রদান করে শয্যা গ্রহণ করলাম। পরের দিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে প্রাতরাশ সেরে আমেদাবাদের কয়েকটি জায়গা ঘুরে এলাম। ফেরার পথে শৌখিন বাসের দুখানা টিকিট কিনে আনলাম। এখানেও আমেদাবাদ কর্পোরেশনের পরিচালিত দুখানি শৌখিন বাস আছে। দুটি প্রত্যহ দুবার করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলি টুরিস্টদের দেখিয়ে আনে। প্রত্যহ সকাল আটটায় আর বেলা দুটোয় ছাড়ে। দক্ষিণা প্রতি টিকিট তিনি টাকা করে। এই সঙ্গে মেসেনা থেকে রাজকোট পর্যন্ত যাতে তৃতীয় শ্রেণীর শয়ন বগিতে আমাদের জন্য

দুটি আসন সংরক্ষিত থাকে তার জন্য আমেদাবাদ স্টেশন থেকে তার করে দিয়ে এলাম।

বাসায় এসে আহারাদির পর আমরা গেলাম 'অম্বিকা মিল' দেখতে। এটি একটি ভারতের অন্যতম বিখ্যাত কাপড়ের কল। এর তৈরী জামার কাপড় আমরা বাংলা দেশে দেখতে পাই। প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা আমাদের আগে থেকেই করা ছিল। আমরা সকলেই যখন ওই মিলের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন দেখি আমাদের জন্য গৃহস্বামীর পরিচিত একজন বাঙালী বন্ধু অপেক্ষা করছেন, তিনি ঐ মিলের অন্যতম কর্মী। তুলো থেকে আরম্ভ করে কাপড়ের শেষ প্রস্তুতি পর্যন্ত আমাদের ভালভাবে দেখানো হল। যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দেশে কি সুন্দর ভাবে যে কাপড় প্রস্তুত হচ্ছে, দেখে খুব আনন্দ হল। এই মিলে শুনলাম প্রায় ৩০০০ কর্মী কাজ করেন। আমেদাবাদস্থ শহরে অনেকগুলি কাপড়ের কল আছে। কাজ আরম্ভের আগে যখন মিলের ভোঁ বাজতে শুরু হয় তখন মনে হয় যেন একটা বিরাট শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে আমরা বসে আছি। এটা অবশ্য সত্য যে আমেদাবাদ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র।

শৌখিন বাসে আমাদের বেলা ডিনার ট্রিপের টিকিট কাটা ছিল। পরের দিন ৭ঠা ডিসেম্বর ঐ বাসে চড়ে সমস্ত শহরটি দেখার জন্যে রওনা হলাম। বাস দাঁড়াবার অফিসের সামনে একটি সুন্দর বাস ঠিক সময়মত এসে দাঁড়াল। সমস্ত সিটগুলি কিছুক্ষণের মধ্যে ভরে গেল। বাসটি ছাড়বার ২-১ মিঃ পূর্বে দেখি একজন ভদ্রমহিলা প্রবেশ করলেন বাসের মধ্যে, প্রথমেই যাত্রীদের নমস্কার জানিয়ে—যাত্রীদের যাত্রা শুভ হোক বলে সম্বোধন করলেন। বাসটি ছাড়ল—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হোস্টেস্ ভদ্রমহিলা শুরু করলেন তাঁর ধারা বিবরণী—আমরা কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বা কি কি দর্শনীয় স্থানকে পাশে রেখে এগিয়ে চলেছি, তার কি

ইতিহাস আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব সমস্ত বলে চলেছেন কিছুটা হিন্দী আর কিছুটা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। আমাদের কোনই অসুবিধা হচ্ছিল না, ধারা বিবরণী শুনতে শুনতে ভাবছিলাম। সে কি সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে হোস্টেস্ মহোদয়া তাঁর কার্য করে যাচ্ছেন, আমরা ডানলোপিলো গদি আঁটা নীল পর্দা দিয়ে ঢাকা অপূর্ব সাজে সজ্জিত বাসের ভেতর বসে কোকো-কোলার বোতলের কাঠিটি মুখে দিয়ে নয়নের দৃষ্টি বাহিরের দিকে রেখে মন দিয়ে শুনতে লাগলাম ধারা বিবরণী। আমাদের গাড়ি গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়, সবরমতি আশ্রম এবং আরো অনেক দর্শনীয় স্থান ঘুরে চলে এলো কাঁঙ্করিয়া লেকে। সবরমতি আশ্রম ও হরিজন কলোনি আমি যখন এর পূর্বে দেখেছি তখন মহাত্মা গান্ধী সেখানে ছিলেন, তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ও দু একটি কথা তাঁর সঙ্গে বলারও সুযোগ হয়েছিল। আজ এখানে এসে আমার সেই পুরনো দিনের কথা মনে হচ্ছিল, মন আমার হয়ে উঠেছিল ভারাক্রান্ত। এই সেই স্থান যেখান থেকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী লবণ আইনের বিরুদ্ধে ডাণ্ডি অভিযান করেছিলেন. এই স্থানটি সবরমতি নদীর কূলে শান্ত মনোরম পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত।

কাঙ্করিয়া জলাশয় বা তলাও ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে নরপতি সুলতান খনন করেন। এই জলাশয় এখন এমন সুন্দর ভাবে রাখা হয়েছে যে ইহা সত্যই শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। এই সুদীর্ঘ সরোবরের চারিদিকে সোপানাবলী আছে। সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে সেটা "নাগিনাবাটী" নামে পরিচিতা। তীর হতে ওখানে যাওয়ারও একটি সুন্দর পথ আছে। এখানে পয়সা দিয়ে নৌকা ভাড়া করে জলবিহার করার ব্যবস্থা আছে। চিড়িয়াখানাটি এই লেকের একধারে। আমরা দেখলাম চিড়িয়াখানা। এর অপর দিকে পাহাড়ের ওপর "বালবাটিকা"। স্বাধীনতা পাওয়ার

পর সরকার শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্যে এই অপরূপ মনোরম স্থানটি তৈরী করেছেন। এখানে শিশুদের জন্য ছোট ছোট ঘোড়ায় টানা এবং হরিণে টানা গাড়ি আছে। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ দেখলাম চড়ে বেড়াচ্ছে।

এইসব দর্শনীয় স্থান ছাড়া এখানে শহরের চারিদিকে আরো অনেক স্মৃতি বিজড়িত ভগ্নাবশেষ আছে। দাদাহরি হ্রদ তার সঙ্গে আছে হরি মন্ক, জুম্মা মসজিদ, চিন্তামণির জৈন মসজিদ, সেকিং টাওয়ার। আমেদাবাদ শহর থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে মহম্মদ বিগারার যে সমাধি আছে সেই মনোরম সমাধিও আমরা দেখলাম। বহু অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন সহ্য করে আজও যে স্মৃতি বেঁচে আছে—তা ভারতের চির গৌরব। আমাদের হোস্টেস্ সুন্দরভাবে সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করে ধারা বিবরণীর মধ্যে দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন; আমরা তন্ময় হয়ে শুনে চলেছি এমন সময় গাড়ি এসে থামল - প্রশ্ন করে জানলাম যে চা পানের জন্য কিছুক্ষণ বিরতি। চায়ের জন্য অনেকের মন বেশ উতলা হয়ে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি নামলাম চায়ের জন্য। দু একটা দোকানে গেলাম কিন্তু মনের মতন দোকান না পেয়ে চা আর আমাদের খাওয়া হল না গাড়ি শুরু করল চলতে - সহযাত্রীদের মধ্যে ২।৩টি মেয়ে বেশ গান গাইতে পারে তারা শুরু করল গান, চা না পেয়ে দমে যাওয়া মনটা সেই গুজরাটী গানের সুরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। আমরা সুরের মাঝে মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে এলাম লাল দরওজা বাস স্ট্যাণ্ডে, তখন সন্ধ্যা প্রায় ৬টা। এই ৫ঘণ্টা ভ্রমণের ফলে শরীর বেশ ক্লান্ত এবং তার সঙ্গে ক্ষুধারও হয়েছে উদ্রেক, তাড়াতাড়ি ৬নং বাস ধরে বাসায় ফিরে এলাম। চা ও জলযোগের পর শরীরটা কিছু সুস্থ মনে হল। তারপর ডাঃ চক্রবর্তী প্রস্তাব করলেন যে চলুন এখানে কয়জন বাঙালী আছেন তাঁদের ওখানে। তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে অনেক কিছু বিষয় আলোচনা করলাম।

জাতির বর্তমান ভবিষ্যৎ বাংলার কথা সবই আলোচনা হল, তাঁদের আদর আপ্যায়ন ও সৌজন্য আমার চিরকাল মনে থাকবে। পরের দিন আমাদের পুনরায় দ্বারকার দিকে রওনা হওয়ার পালা, ব্যাগে হাত দিয়ে দেখি টাকা কমে গেছে—এখন উপায়—ভয় নেই সঙ্গে যে ট্রাভেলার চেক্ আছে স্টেট ব্যাঙ্কের ওপর। রওনা হলাম স্টেট্ ব্যাঙ্কে ঐ চেক ভাঙাতে। এজেন্ট মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে জানালাম আমার কথা—তিনি ৫মিঃ-এর মধ্যে আমার টাকা দিলেন। সেদিন সত্যই মর্মে মর্মে এই ট্রাভেলারস্ চেকের সুযোগ সুবিধা অনুভব করেছিলাম। এতে ৫০'০০ টাকা বা ১০০'০০ টাকার চেক থাকে। প্রয়োজন মত ভারতের প্রায় সব বড় ব্যাঙ্কেই ভাঙান যায়। টাকা সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করার কত যে অসুবিধা তা নিশ্চয় আমায় আর আলাদা করে বর্ণনা করতে হবে না।

আমরা আমেদাবাদ থেকে ৩-১৫ এর ট্রেন ধরে ৬-২০ মিঃ সময় মেসেনা এসে পৌছলাম। আগে থেকেই তার যোগে "মেসেনা রাজকোট" বগিতে যে শয়ন বগি আছে তাতে দুটি বার্থ সংরক্ষিত করা ছিল। টিকিট প্রতি ৩-০৫ নঃ পঃ দিয়ে আসন সংরক্ষণ অফিস থেকে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিলাম, আমাদের গাড়ি কীর্তি এক্সপ্রেস ছাড়বে রাত্রি ৮-৪৭ মিঃ-এ। ঐ গাড়িতেই শয়ন বগিটি যাবে রাজকোট পর্যন্ত। সেখান থেকে আমাদের গাড়ি বদল করে দ্বারকাধামের গাড়িতে উঠতে হবে। এই মেসেনা থেকেই গাড়ি যায় পোরবন্দর, ভেরবিল, দ্বারকাধাম। এখান থেকে যদি সাবধান মত গাড়িতে ওঠা না যায় তা হলেই মুশকিল। এখান থেকে যে শয়নবগি রাজকোট যায় তার বন্দোবস্ত বেশ ভাল। নীচে বসে যাওয়ার জন্য আসন সংরক্ষণ করা যায় আর ওপরের বেঞ্চগুলি বেশ ভালভাবে গদি আঁটা, সেগুলি শুয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের রাত্রে কোন কোন কষ্ট হল না। মেসেনার

রিফ্রেসমেণ্ট রুম বেশ ভাল, আমরা রাত্রের আহার এখানেই সেরে নিলাম। সকাল ৫-২০ মিঃ গাড়ি এল রাজকোট, সেখানে গাড়ি আমাদের বদল করতে হল ৫-৪৫ মিঃ সময় দ্বারকা-ধামের গাড়ি আমরা পেয়ে গেলাম। গাড়িতে ছিল বেশ ভিড়, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে টিকিট পরিবর্তন করে গিয়ে উঠলাম। এখানেও গাড়ি বদলের সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। অনেকগুলি বগি একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় যায় সেই জন্য যেখানে যেতে হবে সেই বগিটিতে ঠিকমত জেনে নিয়ে ওঠাই উচিত। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা একেবারেই খালি ছিল। বিছানা করে আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম আমরা যখন জামনগর এলাম তখন সকাল প্রায় ৯টা। মাঝ পথে বিশেষ কিছু খাওয়ার পাওয়া যায় না। আমরা অনেকক্ষণ থেকে মুখ হাত ধুয়ে প্রাতরাশের আসায় বসে ছিলাম। সেইজন্য জামনগরে গাড়ি থামতেই আমরা রিফ্রেসমেণ্ট রুম থেকে চা, ডিম, রুটি আনিয়ে বেশ ভালভাবে আহার করে নিলাম কারণ দ্বারকা পৌঁছাতে বেলা বাজবে প্রায় ১১৷৹টা তারপর গাড়ি, আবার পথেও দেরী করতে পারে। মনের প্রফুল্লতা তখন ফিরে এসেছে—গাড়ি জামনগর ছেড়ে শহরের মরু পথ ধরে চলতে লাগল তখন আমরা যতদূর সম্ভব ঐ শহরটিকে ভালভাবে দেখে নিলাম। শহরটা মন্দ নয় নেমে দেখলে ভালই হত কিন্তু সময় ছিল না হাতে। গাড়ি সত্যাই কিছুটা দেরীতে পৌঁছাল দ্বারকাধাম—বেলা তখন প্রায় ১টা, এখানে রিটায়ারিং রুম আছে। এখানে ১০ সিটের ঘর ১ খানা আছে তাকে বলে ডরমেটরী; তা ছাড়া ১ সিটের ঘরও আছে খান দুই।

আমরা ঠিক করেছিলাম এখানে কিছুদিন থাকব সেইজন্য বরাবর গিয়ে আমরা তোতাদ্রিমঠ ধর্মশালায় উঠলাম। স্টেশন ছেড়ে একটু এসে প্রথমেই দেখলাম বরোদার রাজার পূর্ণাবয়ব প্রস্তর মূর্তি

—একে ছেড়ে একটু এলেই নজরে পড়ল সিমেন্ট ফ্যাক্টারী - তার চলন্ত যন্ত্রের গর্জনে দ্বারকাপুরী প্রাণময় ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে. এই সৌরাষ্ট্র দেশটির তিনদিকে আরব সাগর। তাই এর নাম কাথিওয়ার উপদ্বীপ। পথের দুই ধারে কেবল চীনাবাদামের ক্ষেত ও কাঁটা বন। সিমেন্টের প্রান্তপথ একটি গিয়েছে মন্দিরের দিকে অপরটি গিয়েছে ওখা রোডের দিকে, আমরা মালপত্র নিয়ে ধর্মশালায় পৌঁছালাম। ঘর স্বামীজীর কৃপায় একটি পেয়ে গেলাম। তিনি আমাদের একটা চৌকিও দিলেন। সেদিন অবশ্য অন্য কোন যাত্রীও সেখানে ছিল না ঘরটিকে আমরা বাসোপযোগী করে রেখে যে পথটি মন্দিরের দিকে গিয়েছে সেই পথ ধরে রওনা হলাম। এই ধর্মশালার কাছাকাছি স্টেশন ছাড়া কোথাও কিছু খাবার পাওয়া যায় না আমরা তখন বেশ ক্ষুধার্ত আহারের সন্ধানে পথ চলতে আরম্ভ করলাম. স্বামীজী পথের নিশানা ঠিক করে দিয়েছেন সেই নিশানাকে অনুসরণ করে চলতে চলতে আমরা এলাম "তিন বাতি" চক। এর আশেপাশে অনেক দোকান-পাট, খাবারের দোকানও আছে আর আছে লজ আমরা দোকানে উঠে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর স্ত্রীর স্বহস্তের রন্ধন খাদ্য উপভোগ করার ইচ্ছা ছিল প্রবল সেইজন্য মাল মসলা সেই রকম কিছু কিছু কিনে নিয়ে টাঙা করে ফিরে এলাম ধর্মশালায়. স্বামীজী মহারাজ বাসন উনুন, কাঠ, কয়লা সবই দিলেন। গিন্নী তৎপরতার সঙ্গে তরকারি সহ ভাত নামিয়ে ফেললেন সন্ধ্যার একটু পরেই আমরা আহার পর্ব শেষ করে নিলাম। এই ধর্মশালায় বিজলী বাতি নেই. লণ্ঠনের আলোতে সব কাজ করতে হয়। আমাদের চোখ বিজলী বাতিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেইজন্য বেশ অসুবিধা অনুভব করছিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে সব শেষে সেই রাত্রির মত নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিলাম। সকালে উঠে দেবদর্শনের অভিলাষ নিয়ে রওনা হলাম মন্দিরের দিকে। মন্দিরের পথে

যেতে অনেক দোকান পথে পরে যেমন সব তীর্থস্থানে আছে। পৌঁছলাম মন্দিরে। দ্বারকানাথের দুয়ারে প্রধান তোরণটির নাম স্বর্গদ্বার—এখানে এসেই ভাবলাম মোক্ষলাভ হবে কি? এখানে এসে সামনে আমরা মহামূল্যবান বেশভূষা রত্ন শৌর্যের মাঝে সম্রাট বেশে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করলাম ও নব ঘন নীল মুখ কমল ও সুচারু নয়ন দুটি। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করেছিলেন তাই এখানে পীত বসন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ নন, এখানে তিনি রাজবেশধারী রন্‌ছোড়জীর দ্বারকানাথ। চিতোরের রাজলক্ষ্মী কৃষ্ণ প্রেমিক মীরাবাঈ শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বামী ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন—প্রবাদ আছে তিনি খুঁজে-ছিলেন তাঁর গিরিধারীলালজীকে। বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ গোস্বামীর কাছে মন্ত্র নেবার প্রস্তাব করেন।

কিন্তু রূপ গোস্বামী তাঁকে কিছুতেই মন্ত্র দিতে রাজী হন না। মীরাবাঈ-এর সঙ্গে এই নিয়ে শোনা যায় নাকি গোস্বামীজীর অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। পরে নাকি গিরিধারীলালজীর আদেশে মীরাবাঈ চলে আসেন এই সুদূর দ্বারকাধামে। তিনি যখন দর্শনের জন্য মন্দিরের সামনে আসেন তখন দুয়ার ছিল বন্ধ সুমধুর কণ্ঠের ভজন সংগীত তখন ধামের আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলেছিল, রুদ্ধ দুয়ার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আকুল হয়ে উঠেছেন মীরার জন্য—এই অবস্থায় দ্বার হল উন্মুক্ত। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল মীরা নেই—পড়ে আছে তাঁর জামা কাপড়। বহুকাল ধরে এই প্রবাদ বাক্যটি চলে আসছে তাঁদের শুধু এইটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' পোশাকী ধর্ম নিয়ে বাঙালী কোন দিন সন্তুষ্ট হয় নি মন্দিরের ঠাকুর যতদিন না অন্তরের ঠাকুর হতে পেরেছে ততদিন তার পূজা করে আনন্দ পায় নি. মীরার ধ্যানলোকে ধ্যানমূর্তী—তাই সুন্দর ও সত্য।

এই দ্বারকাভূমি—এই সেই মীরার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি, গোমতী নদী গিয়ে আরব সাগরে মিশেছে ঠিক তারই বালু সৈকতে দ্বারকা-

নাথের জগৎ মন্দির। মথুরা থেকে চলে এসে শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পৌত্র বজ্রানৎ এই স্থানে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সুদীর্ঘ পাঁচ হাজার বৎসরের অতীত ঐতিহ্য মানুষের বংশানুক্রমিকতার মধ্যে দিয়ে বহে চলেছে, অখণ্ড ধারায় এ গতির বিরাম নেই — শেষ নেই। দ্বারকানাথের নামের উৎপত্তি হল দ্বার অর্থাৎ দুয়ার নাথ অর্থাৎ প্রভু — দ্বার-কা নাথ। ভগবানের রাজ্যের এটি দুয়ার। মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের শিল্প ভাস্কর্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুন্দর ও ভাবময়। এই দেওয়ালের সাতটি তলা আছে। চূড়ার শীর্ষদেশে একটি উজ্জ্বল পতাকা উড্ডীয়মান তৎকালীন বৌদ্ধভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য শঙ্করাচার্য ভারতের চতুর্দিকে যে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে পশ্চিম প্রান্তের গোবর্ধন মঠ ছিল এখানে। উত্তর ভারতের বদ্রীনাথ পথে যোশীমঠ, দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরী শৃঙ্গারী মঠ পূর্ব ভারতে পুরী জগন্নাথ ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম মঠ, এগুলি আজ পর্যন্ত যুগাবতার শঙ্করাচার্যের অবিস্মরণীয় কীর্তির স্বাক্ষর দিচ্ছে।

এদিকে বেলা যে যাচ্ছে স্ত্রী তাগাদা দিলেন মনের খোরাক বেশ তো নিচ্ছ কিন্তু পেটের খোরাক কখন হবে? দর্শন সুখ তন্ময়ত্বটি কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করলাম ধর্মশালায় — এখানে যে রান্নার ব্যাপার আছে সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম, ফেরার সময় মনস্থ করে এসেছিলাম যে সন্ধ্যারতি দেখতে আসব।

বিকালের দিকে আমরা একটি টাঙা নিয়ে অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখতে গেলাম।

রুক্মিণী ও ভদ্রকালীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। প্রবাদবাক্য আছে যে দুর্বাসা ঋষি কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়ে রুক্মিণী দেবীকে কিছুদিনের জন্য বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এই মন্দিরে রত্নচক্ষু বিশিষ্ট রুক্মিণী মাতার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে মহামায়ার

প্রাচীন মন্দির আছে। এটা ৫২ পীঠের মধ্যে একটি পীঠ—কারণ সতীর নাকি পায়ের গোড়ালী এখানে পড়েছিল। টাঙা এসে মন্দিরের কাছে নামিয়ে দিল আমরা গোমতী নদীর ধারে এসে নৌকা চড়ে ওপারে গেলাম লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির দেখতে। প্রচলিত আছে যে পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন এবং এখানে যে ৫টি কূয়া আছে—প্রত্যেকটির জল মিষ্টি, এই কূয়া ৫টি প্রতিষ্ঠা করেন পঞ্চপাণ্ডব। চারদিকে অথৈ সমুদ্রের বেলাভূমির মধ্যে এই ৫টি মিষ্টি জলের কূয়া সত্যই আশ্চর্যের, সমুদ্রের জল কখনও এই কূপের জল নষ্ট করতে পারে না।

ঐ লক্ষ্মীমন্দিরের মধ্যে একটি পাথর দেখলাম। সেটি জলের মধ্যে ভাসছে। শিলামাটির ভাসার কারণ পাণ্ডা বর্ণনা করলেন, যে শিলার উপর 'রাম নাম' লেখা আছে সেইজন্য শিলা ভাসছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম মন্দিরে। সন্ধ্যা ৭টায় আরতি হল শুরু। পুরোহিত মহাশয় একটি পেতলের পদ্মের মত দীপাধারে অষ্টোত্তর শত দীপমালা দিয়ে শ্রী ভগবানের আরতি আরম্ভ করলেন। দরজার সামনে রাজদণ্ড খাড়া করে রাখা হয়েছে দীপালোক। ধূপ ধূনার গন্ধে ও বাজনার শব্দে এবং আরতির পদ্ধতিতে স্থানটি শুধুই সুন্দর হয়ে ওঠেনি মনোরম পরিবেশও সৃষ্টি করেছিল।

সকালে যে সুবর্ণ ও মণিময় আভরণে ভূষিত মূর্তি দেখেছিলাম এখন আরতির পূর্বে নূতন পোশাক পরিহিত মূর্তি দেখলাম পরিধানে মূল্যবান কাপড়ের পায়জামা তারপর কারুকার্যরচিত জামা প্রায় চরণ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা—কাঁধে উত্তরীয় যেন দুইদিকে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মত শোভা পাচ্ছে মণিবন্ধে রচিত রত্নখচিত সোনার বলয়, কানে কুণ্ডল, মাথায় মণি-মাণিক্য সজ্জিত সুবর্ণ সুদর্শন মুকুট এই রাজবেশ। এই বেশ বহুবার দিনে রাত্রে পরিবর্তন করা হয়, এই শান্ত সমাহিত পরিবেশের মধ্যে আমরা আরতি দেখলাম দীপশিখার

তাপ হাতে নিয়ে ফেরার জন্য চেষ্টা করছি—এমন সময় ২-৩ জন বাঙালীর সহিত দেখা হল, তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করে ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়।

পরের দিন সকালে উঠে স্টেশনের দিকে যাচ্ছি গাড়ির বিষয় কিছু জানবার জন্য ঠিক সেই সময় কয়েকজন যাত্রীকে নিয়ে দেখি একটা টাঙ্গা স্টেশনের দিক থেকে আসছে। আমি একটু অন্যমনস্ক ভাবেই এগিয়ে চলেছি হঠাৎ কানে এল, "বাপ বাঁচাও" "বাপ বাঁচাও" "বাপ বাচাও", তাকিয়ে দেখি টাঙ্গার ঘোড়াটা চার পা ছিটিয়ে পড়ে গিয়েছে, গাড়িটাও প্রায় উল্‌টে যাওয়ার মত হয়েছে—ছুটে গিয়ে ভদ্রমহিলাদের হাত ধরে গাড়ি থেকে তুললাম। গাড়োয়ানের সঙ্গে কিছুটা ঝগড়াও হল। সিমেন্টের রাস্তা গাড়ি চালিয়েছিল জোরে—ঘোড়ার পা যায় পিছলে—গারোয়ান সামলাতে পারেনি গাড়িটাকে ঠিকমত, গাড়িতে যে ভদ্রলোকটি ছিলেন তিনি ততক্ষণ বেরিয়ে এসেছেন আমায় প্রশ্ন করলেন, আপনি বাঙালী—আমি বললাম, হ্যাঁ। তাঁরা চলে গেলেন আমিও যথারীতি স্টেশনে চলে গেলাম।

স্টেশন থেকে ফিরে দেখি তাঁরাও আমাদের ঐ মঠের অন্যতম যাত্রী। আমি ফিরে আসার পর তাঁদের সঙ্গে ভালভাবে আলাপ হল, সেই মহিলাটি আমায় বললেন আপনাকে যখন এই তীর্থস্থানে বাবা বলে ডেকেছি বিপদে পড়েই হক আর যে ভাবেই হক—ভগবানের ইচ্ছা যে আপনি আমার বাবা হন, আজ আপনি না থাকলে আমার প্রাণ বাঁচত না। তিনি আবার প্রশ্ন তুললেন যে আপনি আমাকে মেয়ের মত গ্রহণ করলেন তো। আমি বললাম আচ্ছা, তাই হবে। তাঁরাও আমাদের মত দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাঁদের সুবিধা হল তাঁরা রেলওয়ে কর্মচারী—পাশ পেয়েছেন খরচও তাঁহাদের অনেক কম। নিজেরা সব জায়গায় ধর্মশালায় ওঠেন—নিজেদের রান্না নিজেরাই করেন। সকাল সকাল স্নান আহার সেরে

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম ; এখানে এসে খাওয়াটা বেশ ভালই হচ্ছিল কারণ গিন্নীর স্বহস্তের রান্না।

আজও সন্ধ্যায় আমরা দ্বারকানাথের আরতি দেখতে গেলাম। আজ আমাদের দলে অনেক লোক বাঙালী যারা এসেছেন সকলেই একসঙ্গে মন্দিরে গেলাম। এই সন্ধ্যারতি অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক।

পরের দিন সকালের গাড়ি ধরে আমরা রওনা হলাম ভেট-দ্বারকার পথে। পথে সহযাত্রী হলেন ধর্মশালার বাঙালী বন্ধুগণ। দ্বারকা স্টেশন থেকে ওখা প্রায় ২৪।২৫ মাইল পথ—ট্রেনে যেতে সময় লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা। ওখা স্টেশনে নেমে নৌকায় করে আমরা গেলাম ভেট-দ্বারকা। এটি একটি ভাল বন্দর, নৌকা তীর বেগে ছুটে চলেছে। মোটর গাড়িকে যেন হার মানিয়ে দিচ্ছে। কয় মিনিটের মধ্যেই আমরা অতিক্রম করলাম উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্রের এই ৬।৭ মাইল পথ। বীতশঙ্কর—চলতি নাম হচ্ছে ভেটদ্বারকা। অত্যন্ত পুরনো শহর, এখানেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে জ্যোতির্ময় আলোয় রাজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখলাম। ঠাকুরের বেদীতে ঘৃত প্রদীপ জ্বলছে, পাশে আর একটি মন্দির তাতে শ্রীকৃষ্ণের চার রাণী —রুক্মিণী, রাধা, সত্যভামা, জাম্বুবতীর সুন্দর সালঙ্করা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

কিংবদন্তী আছে যে জরাসন্ধের আক্রমণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণীদের মহল এই দ্বীপে স্থানান্তরিত করেন। ভেটদ্বারকা দ্বীপটি আয়তনে ২৪ বর্গ মাইল। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলাম এর সৌন্দর্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যাহ্ন সূর্য্য স্বর্ণাভ কিরণ সম্পদে বন্দনা করছে, অনন্তকালের জীবনাচার্য এই মহাসমুদ্রকে। এখান থেকে আমরা দুই পার্শ্বের ভগ্ন গৃহ দেখতে দেখতে প্রায় ১ মাইল পথ চলে এলাম—সেখানে সীতানাথ ওঙ্কারনাথ স্বামী কিছুদিন পূর্বে চাতুর্মাস্য করেছিলেন। স্থানটি খুবই নির্জন—তপস্যার উপযুক্ত স্থান; এই শান্ত

সমাহিত পরিবেশে এসে আমাদের মনের চঞ্চলতা অনেকটা যেন কমে গেল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে এখানে এসেছিলেন তারও নিদর্শন এখানে আছে। আমাদের সঙ্গে ঐখানে একটি পরিবার মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা বর্তমানে উদয়পুরবাসী, এই পরিবারটি জাহাজ যোগে এখানে এসেছেন বোম্বে থেকে। আজকাল জাহাজে করে বম্বে থেকে ওঘা, পোরবন্দর ভেরাভল আসা যাওয়া করা যায়। তিনি তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যা বর্ণনা করলেন তাতে মনে হচ্ছে এ পথও অতি সুন্দর। আমরা সেদিন মধ্যাহ্নের আহার সমাধা করলাম সন্তোষ ভট্টের বাড়িতে. এখানে শুনলাম বাঙালীরা এসে প্রায়ই ওঠেন ও আহারাদি করে থাকেন। এদের লোক অবশ্য দ্বারকা থেকেই আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল -- নৌকাওয়ালাও আমাদের সেখান থেকেই সঙ্গ নিয়েছিল।

আমাদের আহারাদি মন্দ হল না। এদের ব্যবস্থাটি বেশ ভাল। নৌকার মাঝির সঙ্গে আমাদের আগে থেকেই চুক্তি ছিল যে তারা আমাদের গোপীতলাও-এর ঘাটে নামিয়ে দেবে। আমরা আহারাদি করে ক্লান্তি দূর করে সমুদ্রের তীরে এসে দেখি নৌকা নেই— মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কারণ এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সেই নাবিক মহাশয়কে পাওয়া গেল। একটি কথা এখানেও দ্বারকায় প্রবেশ করার পূর্বে টোল দিতে হয় দ্বারকায় শুনলাম এই টাকা থেকে যে আয় হয় তাতে সেখানকার পৌর-প্রতিষ্ঠান বহু উন্নতিমূলক কাজ করে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর আমাদের নৌকায় ৮টি পাল উঠল---দাঁড়ি শক্ত করে দাঁড় ধরল---বিশাল সমুদ্রে পাড়ি। এখান থেকে গোপীতলাও এর ঘাট প্রায় ৯ মাইল -- যত বেশী হাওয়া পাবে তত বেশী নৌকা যাবে জোর। আমরা সকলে ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় বসে ভাবছি কখন পাব তীর। হঠাৎ নৌকা ঘাটের কিছুটা আগে এসে আটকে গেল কারণ জানলাম ভাঁটা পড়েছে, জল এখানে কম,

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এখন, মাঝিরা সকল রকম কৌশল অবলম্বন করে প্রায় আধঘণ্টার পর নৌকা নিয়ে এল তীরে। এই ঘাট থেকে যেতে হয় গোপীতলাও, বাস তখন আসে নি। এই নির্জন স্থানে ২।১টি ছোট ছোট কুটির ছাড়া কিছুই নেই। গাড়ি যদি না আসে তখন কি হবে—এই কথাই আমরা সকলে আলোচনা করছি এমন সময় দূর থেকে বাসের আওয়াজ পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। আমরা বাসে উঠলাম, এই বাসে করেই আমরা যাব দ্বারকা। গাড়ি গোপীতলাও-এর কাছে এসে দাঁড়াল। এটি একটি ছোট গ্রাম। কিছুটা পথ চলেই দেখতে পেলাম জল শূন্য একটি সরোবর, এই সেই গোপীতলাও। পাঁচ হাজার বৎসর ধরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শেষের পূর্বে এখানে যে তিনি সহস্র গোপী-সহ জলক্রীড়া করেছিলেন তারই স্মৃতি বহন করে আসছে; এই গোপীতলাও-এর মৃত্তিকাকে গোপীচন্দন বলে। এখানে এই মৃত্তিকা বিক্রি হয়। অনেকেই কিছু কিনলেন। আমরাও কিছু নিলাম। নবদ্বীপবাসী আমরা গোপীচন্দনকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। এই তলাও-এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে ময়ূরের ঝাঁক। বহু ময়ূর স্বচ্ছন্দগতিতে গ্রামের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখান থেকে বাসে করে আমরা গেলাম নাগেশ্বর—সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে মূর্তি দর্শন করলাম। সেদিন আমাদের দ্বারকায় ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আমরা আর কোথাও গেলাম না। বেশ ভাল ভাবে চা পান করে শরীরের ক্লান্তি দূর করলাম। কিছুক্ষণ পর মঠের রামবাবু—ব্রহ্মচারী তাঁদের মন্দিরের দেবতার পূজা আরতি দেখার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমরা সকলেই সেদিন শান্ত ও সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আরতি ও পূজা দর্শন করলাম। এই দ্বারকাধামে পানীয় জলের খুবই কষ্ট—এইখানে মন্দিরের বাহিরে যে কূয়া আছে তার জল পানীয় নয়—মন্দিরের এক অংশে একটি কূয়া আছে। বর্ষার সময় ছাদের জল

এই কূয়ার মধ্যে নালির সাহায্যে ধরে রাখা হয়। পানীয় জলটি ধরে রাখার পদ্ধতিটিও বেশ সুন্দর। পরের দিন প্রাতে আমাদের রওনা হাওয়ার পালা—তখন মনে হচ্ছিল বেশ তো ঘর-সংসার পেতে বসে গিয়েছি, দেব দর্শন করছি, আহারাদিও মন্দ হচ্ছে না যদিও নিরামিষ, তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু যেতে যে হবে—রামবাবুর সঙ্গে সমস্ত দেনা-পাওনা মিটিয়ে রাখলাম। এরা রামানুজ সম্প্রদায় অতি সজ্জন; তাঁদের আদর আপ্যায়ন আমাদের মুগ্ধ করেছে। রামবাবু টাঙ্গা আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, ভোর রাত্রে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। আমরা আহারাদি সেরে শুয়ে পড়লাম। টাঙ্গা ঠিক সময় এসে গেল। আমরা অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের সাহায্যে জিনিসপত্র সব তুলে নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলাম, ট্রেন ঠিক সময়ে এল—তখন প্রায় সকাল ৬টা ১৬ মিঃ। একখানা তৃতীয় শ্রেণীর বগিতে মালপত্র তুলে আরাম করে বসলাম। আমাদের মালপত্রের বেশীর ভাগ আমেদাবাদে আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে এসেছি কারণ এ ধারে কুলির খুব অসুবিধা মালপত্র তোলা নামানো খুবই কষ্টসাধ্য। এ ধারের স্থানীয় লোকদের পোশাক পরিচ্ছদ একদম অন্যরকম—বিশেষ করে যাদের রবারী বলে তাদের পোশাকগুলি দূর থেকে দেখলে মনে হয় কাবুলিওয়ালা কিন্তু কাছে এলে অন্যরকম। এরা সাধারণতঃ যাদব সম্প্রদায়, এদের ব্যবহার অতি সুন্দর, আমাদের বগিতে এই সম্প্রদায়ের কয়জন লোক ছিল তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জানলাম যে এরা চাষ-আবাদ করে। জমিজমাও অনেক আছে, মহিষও এরা পালন করে।

সৌন্দর্যের পীঠভূমি, স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান এই ভারত (যা আমার কল্পনার মণিকোঠায় বিরাজ করছিল) তাকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ

করার মানসেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। অনেক ঘুরতে ঘুরতে—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ দ্বারকাধাম দর্শন শেষ করে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দরের পথে পা বাড়িয়েছি।

শীতের সকাল। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছিল। আন্দাজ ৯-৩০ মিঃ সময় আমাদের গাড়ি এসে থামল কেনালুস স্টেশনে—এখানেই গাড়ি আমাদের বদল করতে হবে। কুলী একটিও পেলাম না, নিজেরা ধরাধরি করে মালপত্র তুললাম পাশের প্ল্যাটফরমে। সেখানেই আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির বগিটা ছিল অপরিষ্কার—পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে বসার ব্যবস্থা করা গেল। (দ্বারকা থেকে পোরবন্দর যেতে হলে এই কেনালুস স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়।) এখান থেকে যে গাড়ি যায় তাকে কাট্‌কোলা স্টেশনে কীর্তি এক্স-প্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেয়। জল কয়লা নিয়ে গাড়ি তো তৈরী কিন্তু আমাদের উদরে জল কয়লা জাতীয় কিছু দেওয়া দরকার—কিন্তু কোথায় কি? এখানে খাওয়ার কিছুই পাওয়া গেল না অথচ উদরের জ্বালা অনুভব করছি। শুনলাম কাট্‌কোলায় পাওয়া যাবে কিছু উদরস্থ করার বস্তু—মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম অপেক্ষা কর উপায় তো নেই। কাট্‌কোলায় গিয়ে দেখি সবে ধন নীলমণি একটি মাত্র দোকান, তাতেও আলুর বড়া আর পেড়া ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই। অগত্যা তাই কিনে নিয়ে বগির দিকে ফিরছি, দেখি আমাদের গাড়ির গার্ড সাহেব আমার সামনে। ভাব দেখে মনে হলো অনেকক্ষণ থেকে আমাদের দুরাবস্থা নিরীক্ষণ করছিলেন—স্পষ্টই বললেন, এখানে তো আপনাদের খাওয়ার মত কিছুই পাবেন না, যদি আপত্তি না থাকে আমার সঙ্গে ঘরের তৈরী কিছু খাবার আছে তাই গ্রহণ করুন। দিয়ে গেলেন তাঁর টিফিন কেরিয়ার। পাওয়া খাদ্যের সদ্ব্যবহার আমরাই শুধু করলাম না, ঐ বগিতে অন্য একজন যাত্রী ছিলেন তাঁরও আমাদের মত অবস্থা, তাঁকেও বেশ কিছুটা অংশ দেওয়া গেল। জ্বলন্ত উদরে কিছুটা পড়ার পর শরীর

ও মন বেশ সুস্থ হলো। ততক্ষণ কীর্তি এক্সপ্রেস এসে আমাদের গাড়িটা টেনে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছে।

বেলা আন্দাজ দু'টো, আমাদের গাড়ি পৌছাল পোরবন্দর। এখন বাসস্থানের সমস্যা, কোথায় ওঠা যায়। এখানে সরকার সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ-বিলাসী যাত্রী বা দর্শনার্থীদের থাকার জন্য আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত অতিথিশালা করে রেখেছেন—শহর থেকে এর দূরত্ব কিছুটা। দক্ষিণা স্বাভাবিক। মনোরম পরিবেশে এর অবস্থান। এর নীচ থেকেই সমুদ্র তার উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে চিরন্তন শোভা বর্ধন করছে। আমরা অবশ্য শহরের মাঝখানে প্যারাডাইস হোটেলে উঠলাম। এই হোটেলটিও ভাল। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা। ঘর ভাড়া আর খাওয়া দাওয়া আলাদা আলাদা। যেমন খাবেন তেমন দাম। ঘরগুলি ছোট হলেও আসবাবপত্র বেশ ভাল। আমাদের টাঙ্গা সুন্দর পরিষ্কার সিমেণ্টের রাস্তা ধরে বরাবর নিয়ে এল হোটেলে। যদিও সমুদ্রের গায়ে শহর বলে শীত সামান্যই, তবুও আমরা গরম জল পেয়ে তাতেই ঐ অবেলায় ভাল করে স্নান পর্ব সেরে নিলাম। চায়ের সঙ্গে দু'খান করে টোস্ট, তাই দিয়ে বৈকালিক চা পান শেষ করে কীর্তি মন্দির দর্শন করতে রওনা হলাম। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। মহাত্মা যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই গৃহটিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পবিত্রতার পীঠস্থান রূপে রক্ষা করছেন। গৃহটি ছোট হলেও তার ভিতরের পরিবেশ এতই সুন্দর, স্বভাবতই মনের সমস্ত পঙ্কিলতা দূর করে দেয়।

এই কীর্তি মন্দিরের সঙ্গে আছে গ্রন্থাগার, প্রার্থনা মন্দির, শিশুদের নার্শারী বিদ্যালয়, চরকায় সুতো কাটার জন্য বিরাট একটি হলঘর যাকে বলা হয় spinning Hall, এখানে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ তৈরী জিনিসও পাওয়া যায়। এই কীর্তি মন্দির নির্মাণ করেছেন নানাজী কালিদাস ভাই। পরিচালনার দায়িত্বে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম—তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। সমস্ত ঘরের

ইতিহাস বর্ণনা করে তিনিই আমাদের সব দেখালেন। এমন কি আমার অনুরোধে ফোন করে আর্যকন্যা গুরুকুল দেখার বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে এলাম সমুদ্রের ধারে লাইট হাউসকে পাশে ফেলে। সমুদ্রের পাশে গড়া নতুন শহর ও তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এলাম সরকারী অতিথিশালায়। অতি সুন্দর এই বাড়িগুলি। সেখানকার বেয়ারার কাছ থেকে অনুসন্ধানে জানলাম, ৫৲ টাকা দৈনিক ঘর ভাড়া, খাওয়া আলাদা। ব্যবস্থার তুলনায় দক্ষিণা কম বলেই মনে হলো। তবে হ্যাঁ, স্থান পাওয়া সব সময় যায় না, আগে থেকে লিখে বন্দোবস্ত করতে হয়। পোরবন্দর যার পুরনো নাম সুদামাপুরী—আরেবিয়া, আফ্রিকা ও পারস্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ। আমরা এবারে চলেছি ভগবানের বাল্য-সখার দর্শনে। সন্ধ্যারতি শুরু হচ্ছে এমন সময় আমরা পৌঁছলাম মন্দিরের দ্বারদেশে—সমস্ত মণ্ডপ ভক্তবৃন্দের ভক্তির উৎসাহে ভরপুর—সেখানে উপস্থিত দেখলাম বহু মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত ধনীর ঘরের বধূ, আর দেখলাম সাধারণ জনতা—যার সম্বল সুধু ভক্তি। ধূপ, ধূনার গন্ধে, আরতির ঘণ্টার আওয়াজে, পরিবেশ হয়ে উঠেছিল শান্ত সমাহিত—মনে হচ্ছিল শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কথা, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-সখা সুদামদেবের কথা বলা হয়েছে।—

"দারিদ্র্যক্লিষ্ট সুদামদেব একদা পত্নীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন কিছু সম্পদ লাভ করার জন্য। বহুদিন বাদে সখার সঙ্গে দেখা হতেই তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, আদর আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে বন্ধুকে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন—আমার জন্য কি এনেছ বল? বন্ধু সংকোচে ঈষৎ কম্পিত হস্তে সুদাম বের করেন কয়েক মুঠো চিড়া। শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে তা ভোজন করতে থাকেন; আনন্দ ও বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখেন সুদাম ব্রাহ্মণ। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুদাম যখন বাড়ির

কাছে আসেন, তখন তিনি দেখেন তাঁর কুটীরের কাছে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে বিরাট প্রাসাদ, স্ত্রীও দারিদ্র্যের বেশবাস পরিত্যাগ করে নানা রত্নাভরণে হয়েছেন সুসজ্জিতা। নিজে এবং স্ত্রী ছাড়া যেখানে তৃতীয় কেউ ছিল না সেখানে বহু দাসদাসীর আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈভবের স্বপ্ন দেখছেন যেন সুদাম ব্রাহ্মণ, তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পরিশেষে সুদাম ব্রাহ্মণ যখন দেখলেন সব কিছুই সেই দীনদয়াল লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কাজ তখন ভোরের আকাশের উপরে পড়া আলোর মত সুদামের সমস্ত মুখমণ্ডল হাসিতে ভরে উঠল।"

সুদামপুরীর কথা চিন্তা করতে গিয়ে অতীতে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ রাস টেনে নিজেকে থামিয়ে দিলাম।

হোটেলে গিয়ে আমরা মুখ হাত ধুয়ে তিন তলায় খাবার ঘরে গেলাম। খাবার ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা যতদূর দেখেছি গুজরাটী হোটেলগুলোয় মাছ মাংস পাওয়া যায় না। সেখানে কিন্তু বাসোপযোগী আধুনিকতম সব জিনিসই রয়েছে। এগুলি দেখে মনে হল গুজরাটীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শুধুই যে পছন্দ করে তা নয় এর জন্য যত্নও নেয় যথেষ্ট। খাওয়া এখানে দুরকম। হাফমিল আর ফুলমিল, দাম যথাক্রমে বারো আনা আর দেড় টাকা। ফুলমিল খাওয়া আমাদের ক্ষমতার বাইরে। আমাদের হাফমিলে যা দিল তার নমুনা খুব খারাপ নয়। তাতে ছিল—রুটি, ভাত, তরকারি, দু'রকম ডাল, দই, পাঁপড়। আহার শেষ করে নিজেদের ঘরে চলে এলাম। পরের দিন সকালে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম, সেইসঙ্গে বিছানা ও অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে দিলাম কারণ আজই ছাড়তে হবে, রওনা হলাম· গুরুকুলের পথে। অনেকটা পথ যাওয়ার পর পৌঁছলাম গুরুকুলের অফিস ঘরের সামনে। দেখি আগেকার বন্দোবস্ত মত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন এক ভদ্রলোক। তিনি প্রথমেই নিয়ে গেলেন আমাদের

ভারত মন্দির। এখানে ভারতের ঐতিহ্য বর্ণনা করা হয়েছে ছবির সাহায্যে। বর্ণনাগুলি পৌরাণিক যুগ থেকেই করা হয়েছে। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। সেখান থেকে এলাম কলেজ প্রাঙ্গণে। তারপর এলাম বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন নানাজী ভাই কালিদাস মেটা। বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৫০০ হবে আর মহা-বিদ্যালয়ের হবে প্রায় ১৫০। চারদিকে দোতলা বাড়ি। এক দিকে ছাত্রীরা থাকে আর অন্য দিকে তাদের ক্লাস ঘর। সেদিন বোধ হয় ছুটির দিন ছিল। ছাত্রীরা দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার দেখলাম কোন কোন ছাত্রী এক একটি নিভৃত কোণে বসে পড়াশুনা করছে। এখানে গুজরাটী ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয় ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত। বেদ, উপনিষদ ও গীতা এদের পাঠ্য-তালিকার অংশ। বহু দেশের ছাত্রী এসেছে দেখলাম। দেখলাম না শুধু বাঙালী ছাত্রী। এদের ৪৫৲ টাকা মাসিক চার্জ দিতে হয়। সরকারী সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদেব দেশে এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথাও গড়ে উঠেছে বলে জানা নেই। সরকারী সাহায্য পেয়ে আমাদের বাংলা দেশে অনেকে তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। সরকারী টাকাগুলো নিয়ে অনেক সময় ছিনিমিনি খেলা হয়েছে—এ নজির এখানে বিরল নয়। সরকার সব সময় যে চোখ বুজে থাকেন তা ঠিক নয়। অনেক সময় বন্ধু বান্ধবদের গায়ে আঁচ লাগবে বলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা কিছু করে উঠতে পারেন না।

ছাত্রীদের আহারের ঘরটি দেখলাম, ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রান্না করার কাজও মেয়েদের এখানে শেখানো হয়। ব্যায়ামাগার, সাঁতারের পুকুর এর মধ্যেই আছে। আছে নাট্যশালা। এই নাট্যশালাটি অতি অপূর্ব। চিত্তবিনোদনের এই সুন্দর স্থানে মেয়েরা নাকি অপূর্ব অভিনয় করে শুনলাম।

আমাদের গাড়ি কীর্তি এক্সপ্রেস পোরবন্দর ছাড়বে বেলা ২ টায়। হোটেলে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে স্টেশনের পথে রওনা

হলাম। হাতে নম্বর আঁটা মেয়ে কুলিতে আমাদের মালপত্র নিয়ে একটি খালি তৃতীয় শ্রেণীর বগিতে তুলেছিল। বগি তখন বেশ খালি ছিল, গাড়ি ছাড়তেও ছিল অনেক দেরী। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি পরিবার উঠলেন তাঁরা একটু দূরের যাত্রী—মেয়ে যাচ্ছে শ্বশুর-ঘর করতে, মেয়েকে নিতে এসেছে মেয়েব শাশুড়ী ও স্বামী। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের বলেই মনে হলো। সঙ্গে প্রচুর আহার্য বস্তু বেয়াই বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছেন—বেয়াই স্বয়ং এসেছেন বিদায় দিতে। মেয়ের চোখে জল, বেয়ানের চোখেও দেখলাম জল। ছেলে বেচারা ঘুর ঘুর করছে, উঠছে নামছে—তাঁর মা মাঝে মাঝে মৃদু শাসন করছেন ইতিমধ্যে সময় মত ট্রেনটা দিল ছেড়ে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা না করেই খাবার বার করার জন্য শাশুড়ী ঠাকুরুণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—বেরও করলেন অনেক রকম খাবার। আমাদের বগি তখন কিছু যাত্রীতে ভরে উঠেছে। আমার স্ত্রী খোঁচা দিয়ে আমায় বললেন—দেখ একবার খাওয়ার বহরটা, তোমরা পারবে। অসম্মতি জানালাম। বাংলা দেশে বাস করা পেটে এত সহ্য হবে কেন। চোখকে সার্থক করতে করতে, দেখতে দেখতে চলেছি, মাঝে মাঝে অনেক রকম আলাপ আলোচনাও শুনছি। বহুবিধ যাত্রী ছিলেন আমাদের বগিতে। এ গাড়ি যাবে মেসেনা আমরা যাব ভেরাবল। গাড়ি আমাদের বদলাতে হবে জেতলেশ্বর স্টেশনে। গাড়ি যখন এল জেতলেশ্বর তখন বেলা ৬-২০ মিঃ। এই গাড়ি ধরতে হলে অনেকটা পথ যেতে হয়, প্রায় ছুটে গিয়ে কোনমতে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ি ধরলাম। এই ছোটার কথা মনে দাগ রেখে দিয়েছে। আমরা ভেরাবলের পথে নামলাম জুনাগর—রাত্রি তখন প্রায় ৭-৩০ মিঃ। এখানে নেমে কেম্পিং কোচে থাকবার ব্যবস্থা করে নিলাম। কেম্পিং কোচ হচ্ছে যেখানে রিটায়ারিং রুম নেই প্রায় সেই সব জায়গায় প্রথম শ্রেণীর বগি কয়েকটি থাকে যেখানে যাত্রীরা টাকা দিয়ে থাকতে পারে। ঐ

কোচের ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে আমাদের চক্ষুস্থির। আলো খারাপ, মেঝে অপরিষ্কার, জল নেই পায়খানায়। মনে মনে কিছুটা দোষারোপ করলাম অপদার্থ স্টেশন মাস্টারকে। ফিরে এলাম। সামনা সামনি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে বচসা হলো; তিনি সাফ জবাব দিয়ে বললেন--এখন কিছুই করতে পারবেন না। এদিকে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে--থাকার জায়গা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না। নানান কথা ভেবে বচসা করলাম বন্ধ। তখন মনে হলো যে সরকারের এই সব অকর্মণ্য কর্মচারীদের জন্য আজ আমাদের এই অবস্থা। এমন সময় একজন বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের জানালেন—বাইরে ডাকবাংলো আছে, সেখানে চলুন, ব্যবস্থা করে দেব। স্টেশনের বাইরে সেই ডাকবাংলোতে গেলাম, সেটি লোকে পরিপূর্ণ। তারপর গেলাম একটি হোটেলে সেটিও তথৈবচ। তখন কোন গত্যন্তর না দেখে বাধ্য হয়ে ধর্মশালায় রাতটা কাটালাম। ধর্মশালাটি বেশ বড়, ঘরগুলোও বেশ দীর্ঘায়তন কিন্তু নোংরা, সেটা অবশ্য কর্তাদের দোষ নয় দোষ যাত্রীদের। পায়খানা ব্যবহার করে আমরা জল ঢালব না, ফ্লাস থাকলে তা টানব না—নিজের জঞ্জাল ও ওঁচলা পরের দরজায় ফেলে এসে নিশ্চিন্ত হব।

পরের দিন খুব সকালে উঠে সামনের দোকান থেকে চা-পান শেষ করে গাড়িতে মালপত্র সব তুলে নিয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়লাম গির্ণার পাহাড়ের দিকে। এখানকার টাঙ্গাগুলো একটু নতুন ধরনের বাক্স মতন। চালক পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে মারল চাবুক, গাড়ি ছুটল বাঁধানো পথ ধরে। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই জুনাপুর শহর ছেড়ে গাড়ি চলল গির্ণারের পথে, পাহাড়ের তল কাছাকাছি আসতে ভোরের হাওয়ায় বেশ শীত করতে লাগল। আবহাওয়ার পরিবর্তনটা বেশ মর্মে মর্মে অনুভব করা যাচ্ছিল। গাড়ি শেষ সীমানায় এসে দাঁড়াল। এবার ওঠ পাহাড়ে—বেশী নয় ১০ হাজার সিঁড়ি। এ অতিক্রম করতে পারলে তবে মিলবে

মন্দির। সেই বিখ্যাত জৈন মন্দির বহু পুরনো স্মৃতি বহন করে আসছে। দ্বাদশ শতাব্দীর নেমিনাথের মন্দির বেশ বড়। এখান থেকে সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। আম্বা মাতার মন্দিরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও শোনা গেল এখানে নাকি নব-পরিণীতা বর ও বধূ এসে থাকেন আশীর্বাদের জন্য। এই পর্বতশিখর এত আকর্ষণীয় হলেও আমাদের ভাগ্যে এ যাত্রায় সে সুযোগ হলো না। পায়ে বা ডুলিতে ওঠা যায়। ভদ্রলোক একজন দেখলাম দাঁড়িপাল্লায় ওজন হচ্ছেন। প্রশ্ন করে জানলাম তিনি নাকি ডুলিতে পর্বতারোহণ করবেন, ওজনের পর মূল্য নির্ধারণ হবে। আমরা দুজনাই হেসে ফেললাম। ব্যাপারটা নতুন কিনা মন্দ লাগলো না। তার দক্ষিণা লাগল ৪০৲ টাকা। আমাদের এ যাত্রায় আর ১০,০০০ সিঁড়ি ওঠা হলো না। প্রায় শতাধিক সিঁড়ি উঠে নেমে এলাম। শরীরের শক্তি অতটা ছিল না আর হাতেও ছিল না সময়। ট্রেন ধরতে হবে বেলা ১০টায় ভেরাবলে যাওয়ার। শোনা গেল সরকারী প্রচেষ্টায় ঐ গিরিশৃঙ্গে ওঠার জন্য রোপওয়ে তৈরী হবে। প্রস্তাব শুধু। তৎক্ষণাৎ মনে খেলে গেল তা হলে তো ভালই হবে, নতুন আনন্দ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে গির্ণার শৃঙ্গের মন্দির দর্শন হবে। স্বপ্নের জিনিসগুলি বাস্তবে রূপ নিলে আর একবার আসতে হবে। পাহাড়ের নীচে চা জল খাবারের সঙ্গে আহারের বন্দোবস্ত সহ কিছু দোকানপাটও রয়েছে দেখলাম— পাহাড়ে ওঠার লাঠিও এখানে পাওয়া যায়। ফেরার পথে আমরা বাগীশ্বরী দর্শন করে চললাম সম্রাট অশোকের সেই প্রাচীন শিলালিপি দেখতে। খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২৫০ বৎসর আগে পালি ভাষায় কালো পাথরের ওপর লেখা এই শিলালিপিগুলি। সরকার এগুলোকে রক্ষণ করার জন্য একটা বাড়ি তৈরী করেছেন এর ওপর। সম্রাট অশোকের এই অনুশাসন দেখে মনে যেমন আনন্দ হলো গর্বও হলো বেশ। মনের মাঝে উঁকি দিল সেই

কথা—যে ভারতের কৃষ্টি ঐতিহ্য ও ইতিহাস কত পুরনো। এ ছাড়াও আরো অনেক কটি পবিত্র স্থান দর্শন করলাম। দামোদর কুণ্ড তাদের অন্যতম—হিন্দুদের একটি বিশেষ তীর্থ স্থান। মৃত ব্যক্তির হাড় এই জলে ফেললে সেই হাড় নাকি গলে যায়!—এই প্রবাদবাক্য চলে আসছে। প্রাচীন দুর্গ উপরকোটের পথে চলেছি এবার। ১৩৫০ থেকে ১৩৯২-এর মধ্যে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে এর হয়েছে উত্থান আর পতন। প্রবেশ দ্বারে হিন্দু স্থাপত্যে সুন্দর নিদর্শন স্বরূপ একটি তোরণ আছে এর ভেতরে কিছু কিছু বৌদ্ধ গুহাও আছে যেটা দেখে মনে হয় খৃষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর আগের তৈরী। গিণার পাহাড়ের পায়ের তলার এই পরিত্যক্ত প্রাচীন দুর্গ সরকার এখন রক্ষা করে চলেছেন। বহু প্রাচীন ইতি-হাসের স্মৃতি এ বহন করে আসছে। টাঙ্গা যেখানে দাঁড়াল সেখান থেকে অনেকটা ওপরে উঠে এলাম। সুন্দর একটি জলাশয় তার সঙ্গে দেখলাম নবপ্রস্ফুটিত পুষ্পসহ উদ্যান। অতি মনোরম দৃশ্য। বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষণ। এখান থেকে আমরা গেলাম রাণা মহল। ঘর দরবার! নাচঘর সবই আছে দেখলাম কিন্তু ভগ্নপ্রায়। স্থানটি অতি নির্জন। মাঝে মাঝে সুধু দর্শকবৃন্দ এসে নির্জনতার সুরের তালভঙ্গ করে। নাচঘরে প্রবেশ করেই মনে হল—ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী—তাঁকে বললাম কান পেতে শোন গানও শুনতে পাবে। রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষুধিত পাষাণ লিখেছিলেন—এই সব ভগ্ন প্রাচীন দুর্গ দেখলে স্বভাবতই সেই কথা মনে করিয়ে দেয় "সব ঝুটা হ্যায়"। এই পাথরের মধ্যে—কত না বিফল মনোরথ প্রেমিক প্রেমিকার ক্রন্দন ধ্বনি লুকিয়ে আছে। তারা না জানি কত নিশি যাপন করেছে অভিসারের বাসনা নিয়ে কিন্তু নিশি অবসানে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ করেছে আত্মহত্যা। এ শুধু এরই সাক্ষ্য দেয় না। সাক্ষ্য দেয়

কত বীর যোদ্ধার, কত দেশপ্রেমিকের। আরো মনে হচ্ছিল- যেখানে একদিন সহস্র অস্ত্রধারী পাহারারত ছিল আর যার অস্ত্রের ঝনঝানির আওয়াজ অন্তরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলত—আজ সেখানে শুধু কাকলীর সুর শোনা যায়। দুর্গের সেই ঢালু রাস্তা দিয়ে নামার সময় মনে হচ্ছিল যে এই সেই পথ—যে পথে কত অশ্বারোহী সৈন্য ওঠানামা করেছে, কত না জানি রাণার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর প্রতিটা রেণুর সঙ্গে। আজ সব নিস্তব্ধ!—শুধুই ধ্বংশাবশেষ।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নেমে এসে উঠলাম টাঙ্গায়। ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে এসে বাজারের পথ ধরে পৌছলাম যাদুঘর তার পর গেলাম চিড়িয়াখানা। সেখান থেকে হোটেলে আহারাদি সেরে স্টেশনে এলাম। বিদায়ের পূর্বে মনে হচ্ছিল যে এই সেই জুনাগড় যার নবাব একে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না পেরে পাকিস্তানে দিয়েছেন চম্পট। যাওয়ার সময় জরু ফেলে কুকুর নিয়েই গিয়েছেলেন শোনা যায়। এখন সেখান থেকেই তাঁর বংশধর জুনাগড়ের নবাব। এ দেখছি ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।

সোমনাথের পথে

ট্রেন ঠিক সময় মতই জুনাগড় স্টেশনে প্রবেশ করল। যাত্রীর চাপ বেশী হবে মনে করেই আগে থেকেই তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবর্তন করে নিয়েছিলাম। মালপত্র তুলে নিয়ে একটি বগিতে স্থান করে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে সোমনাথ দর্শনের নিবিড় আনন্দ উপভোগ করছিলাম—এদিকে গাড়ির সহযাত্রীরা কয়েকজন নিজেদের মধ্যেই আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। আমারও চিন্তার তার ছিঁড়ে গেল—দিলাম আলোচনায় যোগ। কথায় কথায় প্রকাশ পেল একজন আমার কলকাতার বিশেষ পরিচিত বন্ধুর আত্মীয়। তাঁর দেশ যোধপুর। রেলের একজন কর্মচারী। বদলী হয়ে এসেছেন ভেরাবলে। তিনি অভিযোগের সুরে প্রথমেই বললেন—এখানে এলেন গিরবনের সিংহ দেখলেন না। উত্তরে জানালাম অনেক অসুবিধা বলেই এ যাত্রায় ওটা স্থগিত রাখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি এই গিরবনের এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সিংহ দেখেছেন? তিনি তার দেখার বর্ণনা আরম্ভ করলেন। কিছুদিন আগে ভি. আই. পিদের ট্রেনে গার্ড হয়ে গিয়েছিলেন গিরবনে। এই গিরবনে যেতে হলে ভেরাবল থেকে শাসনগির স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়া যায়। সেখানে একটি সুন্দর ডাকবাংলো আছে। থাকার কোন অসুবিধা হয় না। জুনাপুরের বন-বিভাগের কর্তার কাছ থেকে অনুমতিপত্রটা আগে থেকেই নিতে হয়। নির্ধারিত টাকা দিলে তারাই সব ব্যবস্থা করে দেন। এই সিংহ দেখার শ্রেষ্ঠ সময় মার্চ থেকে মে পর্যন্ত। তাঁর স্বচক্ষে দেখার সমস্ত দৃশ্য সুন্দর ভাবাবেগের মধ্যে বর্ণনা করলেন। একটি মহিষকে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

কিছু লোক সেই বনের মধ্যে থেকে আওয়াজ করতে থাকে। এই অবস্থা খানিকটা সময় চলার পর দেখা যায় যে, সিংহ ধীর-মন্থর গতিতে মহিষের কাছাকাছি এসেই থেমে যায়। এর পর বসে, থাবা গেরে ঠিক শিকার ধরার মতন করে। তারপর যে লাফটি দিয়ে মহিষের টুঁটি কামড়ে ধরে—তা ঠিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এক লহমায় ঘটনাটি ঘটে যায়। ঐ টুঁটি থেকে নির্গত রক্ত সমস্তই পান করে সে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর সঙ্গে নিয়ে আসে তার প্রিয়তমা সিংহীকে। তারপর দুজনায় আনন্দের সঙ্গেই শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্যন্ত পান করে চলে যায়। আবার ফেরে শাবকদের নিয়ে। রক্ত মাংস উদরস্থ করে। সম্পূর্ণ দৃশ্যটা খানিকটা দূর থেকে বেশ ভালভাবেই দেখা যায়। সব চেয়ে আশ্চর্যের যে, মানুষ দাঁড়িয়ে সিংহদের এই পাশবিক তাণ্ডবলীলা দেখছে কিন্তু সেদিকে সিংহদের কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। গল্প শুনতে শুনতে শরীর রোমঞ্চিত হয়ে উঠলো। ভাবলাম দেখলে না জানি কি হত? এই বনে যে শুধু সিংহ থাকে তা নয়, হরিণ, সম্বর, নীলগাই, বন্য শূকরও আছে। একটি মনোরম মন্দিরও আছে এই বনের মধ্যে। পরিচয় পেয়ে আসছে তুলসীরামের মন্দির বলে। উষ্ণ প্রস্রবণও এর মধ্যে আছে।

ভেরাবল থেকে শাসনগির ছাব্বিশ মাইল। তন্ময় হয়ে তাঁর গল্প শুনছি—ঘোর কেটে গেল যখন, ভদ্রলোক বললেন, এই কেশুদ স্টেশন যেখানে গাড়ি এখন দাঁড়িয়ে—এখান থেকে দু মাইলের মধ্যে একটি ছোট বিমান বন্দর আছে। শোনা যায়, এটি ভারতের ক্ষুদ্রতম বিমান বন্দর। এখান থেকেও গিরবনের সিংহ দেখতে যাওয়া যায়। আমরা এ যাত্রায় শুধু স্টেশনটি দেখে আর গল্প শুনেই যা কিছু আনন্দ উপভোগ করে নিলাম। মনে হলো অহিংসা মন্ত্রের অন্যতম জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান, এখানেও হিংসা এত প্রকট কেন!

বেলা প্রায় ১-৩০মিঃ। আমাদের গাড়ি ভেরাবলে এসে গেল। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামবার সময় ভদ্রলোক বললেন।—স্টেশনের

গায়েই ডাকবাংলো আছে, সেখানেই উঠবেন। তিনি নিজেই ব্যবস্থা করে দিলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ ২।৪ মিঃ আগেই একটা ঘর খালি হয়েছিল। সেটাই আমরা পরিষ্কার করে নিয়ে দখল করলাম। এখানেও সমুদ্রের ধারে পোরবন্দরের মতন সরকারী গেস্ট-হাউস আছে। কিন্তু সেটা দূরে। হাতেরটা ফেলে দূরেরটার অনুসন্ধানে আর গেলাম না। ঐ দিন কুণ্ড স্পেশাল ছিল দাঁড়িয়ে। আমরা ফিরে এলাম স্টেশনে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা নিয়ে। অনেক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো, তাঁরাও বহু দূরের যাত্রী। স্নান-আহার সেরে গল্প জমিয়ে বসেছেন তারা। তখনও তাদের ভিজে গামছা, কাপড় গাড়িময় টাঙান। পান চিবুতে চিবুতে তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা অনেক বললেন। আমাদের পেয়ে তাঁদেরও মন আনন্দে বেশ ভরপুর হয়ে উঠেছিল। তাঁদের বিদায় দিয়ে ফিরে এলাম ডাকবাংলোয়।

ডাকবাংলোটি বেশ সুন্দর, ঘরগুলিও ভাল। জলের কষ্ট নেই। বিছানা, মশারী সবই এরা দেয়। স্বামী-স্ত্রী হলে এরা দক্ষিণা নেয় দুটাকা আর অন্যদের বিছানা প্রতি ৪৷৷৹ টাকা এই নাকি এদের নিয়ম। বাবুর্চির ছেলে এসে তদারক করে গেল। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই নিয়ে এলো চা আর ক'টা টোস্ট। আমরা মুখ হাত ধুয়ে বেশ ভাল ভাবেই তার সদ্ব্যবহার করলাম। এখন ধোপার সমস্যা হলো। আমরা পথ চলতে এটা দেখেছি—কি ধর্মশালায় কি হোটেলে ধোপার কোন অসুবিধা প্রায় কোন জায়গায়ই হয় না। ধুবি সকাল ৮টার মধ্যেই এসে হাজির হয়, দরকার হলে তারা রাত্রেই কাপড় কেচে দিয়ে যায়। প্রতি কাপড় ।৹ আনা, ছোট হলে ৵৹ আনা নেয়।

সেদিন আর দর্শনে না গিয়ে আমরা গেলাম ভেরাবলের বাজার দেখতে। বাজারটি মন্দ নয়। বেশ বড়। প্রায় সকল রকম

জিনিসই পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে পেঁপে ও কলা প্রচুর। আমরাও খালি হাতে ফিরলাম না, কিছু নিয়ে এলাম কিনে। ফিরে এসে শুনলাম এখানকার যিনি রেলওয়ের ডাক্তার তিনি শুধু বাঙালী নন, নবদ্বীপবাসী। স্বভাবতই আলাপের জন্য মন উতলা হয়ে উঠলো। বেড়াতে বেড়াতে তাঁর বাড়ি গেলাম। গিয়ে যখন শুনলাম তিনি বাড়ি নেই তখন মনটা একটু মুষড়ে গেল। ফিরে এসে বিশ্রাম করছি এমন সময় ডাক্তারবাবু স্বয়ং এসে হাজির। কিছুক্ষণ গল্পের পর তিনি পরের দিন বিকালে চা আর রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বিদায় নিয়ে গেলেন। বাবুর্চিটি সংবাদ দিল খানা প্রস্তুত। বাবুর্চিটি বৃদ্ধ হলেও রান্না এর অতি চমৎকার। শুনেছি এ অনেক নবাবের ঘরে কাজ করেছে। কথা শুনে মনে হলো ওস্তাদ লোক। যাক, রাত্রের আহার আমাদের ভালই হলো। শরীর ছিল বেশ ক্লান্ত, ঘুমালাম প্রচুর। মশা এখানে থাকলেও মশাইদের কোন অসুবিধা করতে পারেনি, কারণ ডাকবাংলোর মশারী রক্ষা করেছিল।

পর দিন সকালে যাত্রা হলো শুরু। আমরা রওনা হলাম দেবদর্শনে। এখান থেকে সোমনাথ মন্দির প্রায় ৩।৪ মাইল। আমাদের টাঙ্গা স্টেশন পেরিয়ে সমুদ্রের খাঁড়ির ধার দিয়ে চলতে শুরু করলো। দেখলাম বহু জেলে মাছ ধরছে, কেউ বা জাল-শুকচ্ছে। বাঁধানো পথ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। খানিকটা গিয়ে দেখা গেল রাস্তার ধারে অজস্র কবর। সারা পথটা অনেক কিছু চিন্তা করতে করতে এসে পৌছলাম পুণ্যতোয়া সরস্বতী, হিরণ্য ও কপিল নদীর সঙ্গমস্থলে। আমরা পথে প্রভাসের বাজার ও ভারত বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির পাশে রেখে চলে এসেছি ফেরার পথে দেখব বলে। ত্রিবেণীর পুণ্য পবিত্র জল স্পর্শ করেই ধন্য হলাম। এই তীর্থের উল্লেখ আছে মহাভারতে। পাণ্ডবেরা এখানে তীর্থ করতে এসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এসেছিলেন। এসেছিলেন জয় ও পরীক্ষিত।

এরপর আমরা এলাম সূর্য মন্দিরে। সেখান থেকে নারকেল গাছের সারির মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে এলাম সেই পূত পবিত্র স্থানে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের দেহোৎসর্গ হয়েছিল। সুন্দর শান্ত, নির্জন পরিবেশ। শোনা যায় এই হিরণ্য নদীর তীরে বল্লভাচার্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সপ্তাহ ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতের পুরশ্চরণও হয়েছিল এখানে—তার নাম শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীর বৈঠক।

আমরা এবার চললাম দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের সেই জগৎবিখ্যাত সোমনাথ মন্দির দর্শনে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শাস্ত্রে, পুরাণে, সাহিত্যে এই সোমনাথের মহিমা বর্ণনা করা আছে। এর ঐশ্বর্য দেশ-বিদেশের মানব মনকে আকর্ষণ করেছে। যুগ যুগ ধরে পর্যটকগণ এর মহিমা কীর্তন করেছেন। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর সৌন্দর্যে ও গরিমায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভারতের পশ্চিম, আরব সাগরের তীরে, সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এই প্রভাস পত্তন। অতি প্রাচীন কালে এই সোমনাথের মন্দির ছিল সোনার, ত্রেতায় রাবণ রূপ দেন রূপায়, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এই মন্দির তৈরী করেন কাঠে। সোমনাথ লিঙ্গ ভক্তিভরে স্পর্শ করলে আগে নাকি ব্যাধি মুক্ত হওয়া যেত। মানুষ এই লিঙ্গ স্পর্শে উত্তম জীবে পরিণত হত। ত্রিবেণী স্নানে পাপ স্খালন হত। আজও হয়। আমাদের বিশ্বাস কমেছে বলেই দেখতে পাই না বা বুঝতে পারি না। পূর্বে কত নরনারী সোমনাথের মস্তকে মণিমুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য ঢেলে দিতেন। শোনা যায়, এই বিগ্রহের সেবার জন্য দশ হাজার গ্রাম উৎসর্গীকৃত ছিল। এখানে শত শত ব্রাহ্মণ পূজা করতেন, কত না দেবদাসীর নৃত্য এখানে হত। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ এই মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেন। ভারতের সহস্র নরনারীর মনে যে ভক্তি বিরাজমান ছিল এই ধ্বংসলীলায় তার এতটুকু

মাত্র ক্ষুণ্ণ হলো না। ভক্তির উৎস গেল বেড়ে। বার বার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, ধ্বংস ও লুণ্ঠনের মধ্যে শাশ্বত সত্য এই ধর্মের, এই ভগবৎ প্রেমের শক্তি বিনষ্ট হতে পারে নি। সোমনাথের মন্দির ভেঙে ঔরঙ্গজেব যে মসজিদ তৈরী করেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় যে গ্লানির চিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন ঠিক তারই কাছে—১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সাধ্বী ভগবৎ প্রেমিকা রানী অহল্যাবাঈ সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করেন এখন যার অস্তিত্ব দেখে এলাম আমরা। ভারতের আকাশে যখন স্বাধীনতার নব সূর্যোদয় হল ১৯৪৭ সালে, ভারত তখন তার নিজস্ব ঐশ্বর্য সুখ, শান্তি. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করার যে সংকল্প গ্রহণ করেছিল, নতুন সোমনাথের মন্দির সেই সৃষ্টি যজ্ঞের অন্যতম।...

লৌহমানব সর্দার প্যাটেল স্বাধীনোত্তর যুগে একদিন সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্ব-মানবতার পীঠস্থানের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার যে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন আর যার দ্বার উদ্ঘাটন করে-ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সেই চির আকাঙ্ক্ষিত সোমনাথের মন্দির নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ করা হয়েছে। দেখে মনে হল বর্তমানেও ভারতের স্থাপত্যশিল্পের কাজ অপূর্ব মনোরম। এই মহাপুণ্য তীর্থ তার অমৃত রস নিয়ে বিশ্বে চির জাগ্রত থাকবে।

এই মন্দিরের পুরাণ-স্মৃতি ও স্থাপত্যশিল্প ও কারুকার্য একটি-সংগ্রহশালা রাখা হয়েছে। দেখে মনে হয় ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে বহন করে আসছে এই স্থাপত্য ও শিল্পের রূপ সৌন্দর্য যার খ্যাতি আজ সারা বিশ্বে। এখানেও একটি জৈনদের মন্দির আছে। আমরা প্রভাস থেকে ফেরার পথে বাজার থেকে কিছু কলা ও পেঁপে কিনে নিয়ে এলাম ভাল্লা ও ভাল্কা তীর্থে। এখানে একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটি অপূর্ব মূর্তি দেখলাম। মূর্তিটি মাটির, অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে আছেন। তাঁর একটি পায়ের নীচে রক্তের দাগ। এখানে এই গাছের নীচে শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্রাম

করছিলেন তখন ব্যাধ হরিণ ভ্রমে বাণ ছুঁড়েছিল, লাগল গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে—এর বর্ণনা অনেক যায়গাতেই আছে—সেই-জন্যেই এখানে আর দিলাম না। এখানে একটি জলাশয় দেখলাম। জল তাতে নেই বললেই হয়। এর নাম ভলকা কুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করলে পুণ্য সঞ্চয় করা যায়। আমরা সেখান থেকে ফিরে এলাম ডাকবাংলোয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মধ্যাহ্ন আহারের পর্ব শেষ করে নিলাম। বিকালে আমাদের ডাক্তারবাবুদের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। বিকেল ৪টার মধ্যেই আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে অনেক গল্প আর তার সঙ্গে অনেক রকম ভাজা ভুজি দিয়ে চা-চক্র শেষ করে রাত্রের আহার ডাক-বাংলোয় পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে এলাম।

পরের দিন, ১৪ই ডিসেম্বর, সকাল ৮টার মেল ধরে আমরা আমেদাবাদের পথে রওনা হলাম। সকাল সকাল এসে একখানি বগিতে মালপত্র তুলে নিজেদের বসার বেশ জায়গা করে নিলাম। সমস্ত দিন আজ আমাদের এই পথেই চলতে হবে। মিটার গজের ছোট গাড়ি মন্থরগতিতে চলবে। এই গাড়ির সঙ্গেই খাওয়ার গাড়িটাও লাগানো আছে। আমাদের বগিটি খাওয়ার গাড়ির সঙ্গে লাগোয়া। সেইজন্য পথে খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্টই হয় নি। সময় মত চা আর মধ্যাহ্নভোজ হয়েছিল। আমাদের গাড়ি সন্ধ্যা ৭।৪৫ মিঃ সময় ভিরমগ্রাম এসে পৌছাল। এখানে গাড়ি বদল করে ব্রডগজ ধরে আমাদের আমেদাবাদ যেতে হবে। নেমেই দেখি সৌরাষ্ট্র মেল ধোঁয়া ছাড়ছে—মনে হল ছোটার জন্য ছটফট করছে। গাড়িতে মোটেই স্থান নেই—লোকে বোঝাই। একে সমস্ত দিনের পথ চলার ক্লান্তি। এর ওপর সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি, কিন্তু প্রবেশ করার উপায় নেই। খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লাম। কিছু ছোটাছুটি করে কোন মতে একটি বগির করিডরে বিছানাটা খাড়া করে তার ওপর বসার স্থান করে নেওয়া গেল। পথ তো মাত্র

২ ঘণ্টার। রাত প্রায় ১০টার সময় গাড়ি পৌঁছাল আমেদাবাদ। স্টেশন থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে বরাবর চলে এলাম সেই আত্মীয়ের বাড়ি। তাঁদের তখন অর্ধেক রাত্রি। বহু ডাকাডাকি করে তাঁদের তুলে নিজেদের মাথা গুঁজবার স্থান করে নিলাম। ভারতবর্ষের মানচিত্রে বাল্যকাল থেকে দেখা সেই "স" র দেশগুলি প্রায় দেখা শেষ করে এসেছি। যাত্রা এবার অন্য পথে। ভ্রমণ পথে পা বাড়াবার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প কমিশনার মহোদয়ের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আনান্দ কারিয়া জেলা সমবায় দুগ্ধকেন্দ্র ও বম্বের আরেক শিল্প কলোনী দেখার সকল রকম ব্যবস্থা করে নিয়েছি। আনান্দ গ্রামের সঙ্গে আমার পূর্বে পরিচয় ছিল। ১৯২৮ সালে ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন ওখানে ছিলাম। এই পূর্ব পরিচিত ছাত্রজীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত স্থানটি দেখার জন্য মনটা বেশ উতলা হচ্ছিল। ১৬ই ডিসেম্বর আমেদাবাদ থেকে ১।৩০ মিঃ সময় রওনা হয়ে ২।৪৫ মিঃ সময় আনান্দ পৌঁছলাম। মালপত্র নামিয়ে ভাবছি, কই কেউ তো এখনো নিতে এলেন না। আগে থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে এই সময় আমরা পৌঁছচ্ছি। এখন কি করা যায়? স্ত্রী একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন, শুধু শুধু এলে, কেউ আসবে না আমাদের নিতে। ঠিক এমনি সময় কিছু দূরে দেখি টুকটুকে ফর্সা রং খদ্দরের হাওয়াইয়ান শার্ট ও প্যান্ট পরা একজন আমাদের দিকে আসছেন। হাতের মোটরের চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে আমাদের সামনে এসে নমস্কার করে বললেন—'আপনি মিঃ বাগচী—? আশ্বস্ত হলাম। স্বীকারোক্তিও জানালাম। এর মধ্যেই তিনি যে মিঃ ভাট্ তা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরো জানালেন, মিঃ কুইরিয়ান তাঁকে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য জানিয়েছেন। আমরা গল্প করতে করতে ওভার ব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের সামনে

এলাম। কুলি আমাদের মালপত্র নিয়ে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে। মালপত্র তিনি একটি টাঙ্গায় তুলে দিয়ে বললেন, 'মিল্ক কলোনীর গেস্ট হাউসের সামনে নিয়ে রাখ., আমরা মোটরে যাচ্ছি।' আমরা মোটরে গিয়ে উঠলাম। মিঃ ভাট্ স্বয়ং চালক। আনান্দের রাস্তা ঘর-বাড়ি দেখে কিছুই চিনতে পারলাম না। ভাবতে ভাবতে গেলাম—আমাদের সেই চিরপরিচিত কাঁচা রাস্তা কই স্টেশন থেকে ইমপিরিয়াল ক্রিমারী যাওয়ার? কেরোসিনের আলো কই? নোংরা রাস্তা কই? তখন মনে হলো সত্যি, কতই না উন্নতি হয়েছে এই দেশের। আমি মিঃ ভাট্কে বললাম, কি অপূর্ব পরিবর্তন হয়েছে এই দেশের। যারা পূর্বের অবস্থা না দেখেছে তারা এই পার্থক্যটা বুঝতে পারবে না। আমাদের গাড়ি এতক্ষণ খাইরা জেলা সমবায় দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের গেটের সামনে এসে গেল। গাড়ি ভিতরে প্রবেশ করে অনেক কটি সুন্দর সুন্দর বাংলোকে পাশে রেখে সোজা চলে এল গেস্ট হাউসে। এইখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, জানালেন মিঃ ভাট্। আমাদের থাকার ঘর তৎসংলগ্ন আধুনিকতম অপূর্ব সাজ-সজ্জায় স্নানাগারটি দেখিয়ে মিঃ ভাট্ বললেন, 'নিশ্চয় এখানে থাকতে কোন কষ্ট হবে না?' ঘরখানিতে ডান্‌লোপিলো গদি সহ দুখানি খাট্। রুচি-সম্মতভাবে ঘরখানি সাজানো। আসবাবপত্রের কোন অভাব নেই। গেস্ট হাউসের লোক আমাদেব মালপত্রগুলি ঘরে রেখে দিয়ে গিয়েছে। আমাদের আর বিছানা খুলতে হলো না। বেয়ারা একটু পরে ট্রে করে চা নিয়ে এসে হাজির আর নিয়ে এল তার সঙ্গে আমার ক্রিমারী দেখার কার্যসূচী। গ্রামের মধ্যে সমবায় প্রথায় দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র দেখার জন্য ঠিক ৫৷৹ টার সময় গাড়ি এসে হাজির হলো। আমরা শহরকে পাশে রেখে রেল লাইন পেরিয়ে একটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমাদের সাথী ছিলেন কয়েকজন শিক্ষার্থী, তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছেন। ইউনিএস-

এফ-এর ব্যবস্থায় এদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। গাড়ি গিয়ে একটি দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্রে দাঁড়াল। এই কেন্দ্রের এটি নিজস্ব ঘর। দুগ্ধ পরীক্ষার যন্ত্রপাতি "গরবর টেস্ট" যার সাহায্যে দুগ্ধের স্নেহ পদার্থ পরীক্ষা করা হয় তাও এদের নিজেদের আছে। সমস্ত ব্যবস্থাটিই বেশ সুন্দর সাজান গোছান। সমবায় সমিতির সদস্যগণ দুধ নিয়ে এসে ঘরের বাইরে থেকে দুধ ঢেলে দিচ্ছেন; ভেতরে একজন কর্মী আছেন, তিনি তার নমুনা নিয়ে ওজন দেখে সমিতির সেই সদস্যের নাম লিখে রাখছেন। দামটাও তাঁরা পেয়ে যাচ্ছেন। দুধের স্নেহ পদার্থের ওপর দাম ধার্য হয়। কারো মুখে বিশেষ কথা নেই—কিন্তু কাজ সুষ্ঠুভাবেই হয়ে যাচ্ছে। সংগ্রহ কেন্দ্রটিকেও সব সময় পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থাও আছে। এই সমবায়ের অধীনে ১৮৯টা সমিতি আছে। সেগুলির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ হাজার। প্রত্যেকে তাদের যে মহিষ আছে তার দুধ নিকটবর্তী সংগ্রহ কেন্দ্রে এনে দিয়ে যায়। নারসান্দা গ্রাম সমবায় সমিতির নিজস্ব যে কার্যালয় আছে সেটাও অতি সুন্দর। এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩২৮ জন। এরা আধ মাইল ব্যাসের মধ্যে বাস করে। প্রায় ২০০০ পাঃ দুধ দৈনিক সংগ্রহ করে। খাইরা ইউনিয়ন এই সব সমিতিকে বহুভাবে সাহায্য করেন। যথা, স্কুল গৃহ, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে টাকা সাহায্য করে থাকেন। ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসালয় আছে—তার মাধ্যমে পশুগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পশুর উন্নতি সাধনের জন্য কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা আছে। এই ভাবে কয়টি দুগ্ধকেন্দ্র দেখে ফিরে এলাম গেস্ট হাউসে। মুখ হাত ধুয়ে রাত্রের আহারের জন্য প্রস্তুত হতে হলো কারণ, এখানে সবই নিয়ম মত আর সময় মত করতে হবে। আহারের ব্যবস্থা দেখলাম ইংরাজী কায়দায়। আমাদের টেবিলে সে রাত্রে দুইজন ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক ছিলেন। এঁদের মধ্যে এক জন ডেনিস্ অন্যজন আমেরিকান। খানা টেবিলে

বসে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের কত উন্নতি সাধিত হয়েছে তা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। এটা অবশ্য তাঁরা স্বীকার করলেন যে বর্তমানে ভারতের এই জাতীয় প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ভারত সরকার যে ভাবে দুগ্ধ উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছেন তাতে তাঁদের বিশ্বাস যে, খুব দ্রুতগতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে আমরা সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরের দিন সকালে আমাদের আমূল মাখন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিঃ কিউরিয়ান স্বয়ং এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে আমরা ফ্যাক্টরীতেও গেলাম। সমবায় প্রথায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠার ইতিহাস আলোচনা করে জানলাম—১৯৪৬ সালে আমাদের সর্বজনপূজ্য স্বর্গগত নেতা সর্দার বলভভাই প্যাটেলের আন্তরিকতায় ও প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এখন এটা ভারতের অন্যতম বৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠান। প্রথমে ৬টা সমবায় সমিতি নিয়ে ৫০০ পাঃ দুধের সরববাহের ব্যবস্থা নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। আজ গরমের দিনে এক লক্ষ পাঃ আর শীতের দিনে আড়াই লক্ষ পাঃ দুধ প্রত্যহই এই ফ্যাক্টরীব মাধ্যমে সমস্ত রকম আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বনে সরবরাহ করা হয়। এখান থেকে প্রত্যহ ৮০ হাজার পাঃ দুধ প্যাসটুরাইজ করে বম্বের আরে মিল্ক কালানীতে একটি Insulated Rail Road Tanker-এ পাঠানো হয়। এখানে উনিসিফ ৮ লক্ষ টাকা দান করেছেন। তার পরিবর্তে ৬ আউন্স করে দুধ প্রত্যহ ১৬ হাজার ছেলের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে বিনা পয়সায় দিতে হয়। সেখানে একথাও শুনলাম যে বরদা দুগ্ধ সমবায় সমিতি খায়রা ইউনিয়নকে তাদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছে। ইউনিয়নটি কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ইন্‌জিনিয়ার, ও টেকনোলজিস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। এদের ওপরে আছেন কয়েজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। এই প্রতিষ্ঠানের

উন্নতি কল্পে এদের অবদান প্রশংসনীয় ও চিরস্মরণীয়। মিঃ কিউরিয়ান আমাদের ডাঃ কনট্রাক্টারের হাতে সঁপে দিলেন। তিনি এবার আমাদের ফ্যাক্টরীর ভিতরের সব কাজগুলি দেখাতে লাগলেন।

আমরা প্রথমে গেলাম সমস্ত সমবায় কেন্দ্র থেকে যেখানে দুধ এসে জমা হয় সেখানে। এইখান থেকেই যন্ত্রের সাহায্যে দুধ ওজন হয়ে ঢেলে দেওয়া হয় একটি পাইপের মধ্যে। সেখান থেকে দুধ বরাবর পাইপের সাহায্যে চলে আসে প্যাস্টুরাইজিং ইউনিটে—সেখান থেকে যে দুধ বম্বে যাবে তা বরাবর Insulated Stainless Steel Tanker-এ চলে যায়। আর কিছু দুধ চলে যায় ক্রীম সেপারেটরে মাখন তৈরীর জন্য। ক্রীম থেকেই মাখন তৈরী হয়। ঐ মাখন যন্ত্রের সাহায্যে আপনি প্যাকিং হয়ে যায়। কিছু হয় কাগজের প্যাকিং আর কিছু টিনের প্যাকিং। দুধের কিছু অংশ Spray Type Milk Powder-এর জন্য ব্যবহার করা হয়। আর কিছু দুধ Condensed milk হয়। কর্তৃপক্ষ Cheese making-এর যন্ত্র বসিয়েছেন। শিশুদের খাদ্য Baby Food-ও এখানে তৈরী হচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থায় বৎসরে ৫০০ টন Baby Food প্রস্তুত হবে। Cheese এরা প্রায় ২৫০০ টন তৈরী করতে পারবেন। প্রতিটি জিনিস আধঘণ্টা অন্তর ল্যাবেরটরীতে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, দোষশূন্য ভাবে ঐ সকল দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী হচ্ছে কি না। ১ পাঃ করে দুধ প্রত্যহ প্রতি কর্মীকে দেওয়া হয়। এখানে প্রায় ৩০০ কর্মী কাজ করেন। শিশুখাদ্য প্রস্তুত প্রণালী যা দেখলাম তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এঁরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বীজাণুমুক্ত করার সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। যে ঘরে Baby Food তৈরী হচ্ছে সেটা কাঁচের ঘর—ভেতরে বাইরের লোক কেউ যখন তখন প্রবেশ করতে পারেন না—যাঁরা ভেতরে কাজ করছেন তাঁরা সমস্ত দেহটা apron দিয়ে ঢেকে কাজ করছেন। পদ্ধতি প্রশংসনীয়, আমরা এই শিশু খাদ্য

কিছুটা খেয়ে দেখলাম বেশ সুস্বাদু। পৃথিবীর অন্য দেশে তৈরী শিশু খাদ্যের সঙ্গে তুলনায় কোনমতেই কম যাবে না। এর পর আমরা গেলাম যেখানে সব দুগ্ধজাত দ্রব্য রাখা হয় সেই ঠাণ্ডা-ঘরে। মাখন ও cheese এ-ঘরে রয়েছে। এইগুলো— দেখতে দেখতে আমার মনে হলো—আজ যদি ভারতের প্রতিটি জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে এই রকম কেন্দ্র গড়ে উঠত তাহলে দেশে বর্তমানে যে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের সমস্যা কঠিন ভাবে দেখা দিয়েছে, তার অনেকটা কেন প্রায় সবটাই, সমাধান করা যেত। আমাদের দেশে সমবায় প্রথায় যে কোন কাজ হয় না তা নয়—অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলো নিষ্ক্রিয় বা দল করার জন্য রাখা হয়েছে। এই ফ্যাক্টরীতে দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রস্তুতির জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলি সবই আধুনিকতম। এই সব যন্ত্রপাতির দাম মনে হয় আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা হবে। এই সমিতির বাৎসরিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা, এই লাভের টাকা সমিতির বহু উন্নতিকর কাজের জন্য ব্যয় করা হয়। মিঃ কিউরিয়ান আগে থেকেই আমাদের কৃষি গো-বিদ্যা ভবন ও পল্‌সন্ ডেয়ারী দেখাবার সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা পল্‌সন্ মাখন ডেয়ারী দেখতে গেলাম। এই ডেয়ারী ফার্ম ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা করে আসছে। আমরা যখন ছাত্রাবস্থায় আনান্দে ছিলাম তখনও এদের ফার্ম ছিল কিন্তু জানি না কোন্ কারণে আমাদের ভেতরে যেতে দেওয়া হয় নি। এ ছাড়া এঁদের সব চাইতে পুরাতন কারবার কফির। পার্শীদের ঘরের একটি ছেলে নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছোট একটি কফি গুঁড়ো করার যন্ত্র কিনে কফি বিক্রির ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁর সেদিনের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আজ সারা ভারতে নাম করা প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এ কথা অস্বীকার করলে অন্যায় হবে যে, এই কর্মবীর পেস্‌টনজীই ভারতে যন্ত্রের সাহায্যে মাখন প্রস্তুত

প্রণালীর প্রবর্তক। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে অনেকগুলি মিলিটারী ডেয়ারী ফার্ম ছিল। তাদের কাজ ছিল মিলিটারীদের ভাল দুধ মাখন সরবরাহ করা। ভারতবর্ষে তখন মাখন আসত ভারতের বাইরে থেকে। তখন ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান গত প্রচেষ্টায় কেবল মাত্র ২।১ টা মাখন তৈরীর কারখানা ছিল। দার্জিলিং-এ কেভেণ্ডার তাদের অন্যতম। আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে বহু স্থানে মাখন তৈরী হচ্ছে। দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রও অনেক হয়েছে। যদিও আমাদের সমস্ত অভাব এখনও মেটেনি - কবে মিটবে সেই আশা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব। পলসন কোং-এর একজন বিশিষ্ট কর্মচারী আমাদের নিয়ে তাঁদের সমস্ত কারখানাটা দেখালেন। দুধ প্রথম কোথায় নেওয়া হয় সেখান থেকে আরম্ভ করে কি ভাবে ঐ দুধ থেকে ক্রীম আলাদা করা হয়, আবার ঐ ক্রীম থেকে কি ভাবে মাখন তৈরী হচ্ছে। এমন কি মাখন তৈরী হওয়ার পর কিভাবে প্যাকিং হচ্ছে সমস্ত আমাদের দেখালেন। সমস্ত পদ্ধতিটা হাতের স্পর্শ ব্যতিরেকে যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে যাচ্ছে। ফেরার পথে একখানা ট্রেভেলার্স-চেক স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমরা এলাম কৃষি গো বিদ্যাভবন। Institute of Agriculture, Anand। এরও অতীত ইতিহাস অতি সুন্দর ও মনোরম। শেঠ মন সুখলাল চাগনলাল ট্রাস্টের নয় লক্ষ টাকায় ১৯৩৭ সালে এর সূচনা হয়। পরে জানা যায় যে, মগনলাল গোয়েংকা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে ছয় লক্ষ টাকা দান করেন। সরদারজীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় এই সকল সাহায্য পাওয়া যায়। মুন্সিজীও এই কার্যে অনেক প্রেরণা যুগিয়েছেন। তখন ভারত ছিল পরাধীন। অনেক কিছু অসুবিধা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এঁদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানের ওপর অনেক আঘাত এসেছে। দেশবাসীর প্রচেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি উন্নতির সোপানে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে।

এখানে সকল রকম কৃষি ও গো-পালন সম্বন্ধে পড়ানো হয়। গবেষণাও হয় অনেক বিষয়ের। আমাদের প্রতিটি বিভাগ ও তার কার্য পদ্ধতি দেখানো হয়েছিল। ল্যাবরেটরীতে কি ভাবে গবেষণা হয় তাও দেখলাম। অনেক ছাত্র বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে পড়াশুনা করার জন্য এসে থাকেন। কাঁকরাজ গাই আমরা এখানে দেখলাম। গুজরাটে এই গরুর বেশ সুনাম আছে। এমন গরুও দেখলাম যে-গুলি দৈনিক ৪৬ পাঃ করে দুধ দেয়। এখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি চা-চক্রে বসে এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা করলাম।

আমরা বেলা প্রায় একটায় ফিরে এলাম গেস্ট হাউসে। একটু বিশ্রাম করে হাত মুখ ধুয়ে সেরে নিলাম আমাদের মধ্যাহ্নের আহার। বেলা আন্দাজ ২৷৽ টায় আবার গেলাম ফ্যাক্টরীতে। সেখানে বাকী কাজগুলির দেখা সেরে নিলাম। তারপর এঁদের অফিস বিল্ডিং-এ গেলাম উচ্চপদস্থ কয়জন অফিসারের সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনার জন্য। এঁদের অফিসের কাজের ব্যবস্থা বেশ ভাল। এদিন বিকেলে গেস্ট হাউসে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের বিদায় দিন বলে- বিদায় সভার আয়োজন হয়েছে। তাকেই উপলক্ষ্য করে চা-চক্রের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাকেও তাঁরা আহ্বান করেছিলেন যোগদানের জন্য। একে একে শিক্ষার্থীগণ এসে গেস্ট হাউসের ঘরখানিকে আনন্দে মুখর করে তুললেন। প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মিবৃন্দও এলেন। অনেক প্রদেশের শিক্ষার্থীদের দেখলাম-- দেখলাম না শুধু বাংলার। খাবারের টেবিলে বহুরকম গুজরাটী খাবার সাজানো। কিছু কিছু করে ঐ খাবার ডিসে নিয়ে আহারের সঙ্গে সঙ্গে গো-পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উন্নতি সাধনের সম্বন্ধে আলোচনা চলে। উনেসফির প্রতিনিধিদ্বয় ভারতের বর্তমান গো-পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতির সঙ্গে ইউ-রোপের ব্যবস্থার তুলনা করে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলেন

যে, ভারতবর্ষ এই ১২ বৎসরে এ বিষয়ে অনেক এগিয়েছে। অনেক স্থানে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতির জন্য ফ্যাক্টরী তৈরী হয়েছে। ভারতবর্ষে চীজ মাখন গুঁড়া দুধ ও শিশুখাদ্যও হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেন। শিক্ষার্থীগণ এখান থেকে চলে যাবেন বম্বের আরে মিল্ক কলোনীতে। আমার সঙ্গেও এঁদের অনেক কিছু আলোচনা হলো। বিদায়ী সভা শেষ করে আমরা পায়ে হেঁটে কলোনীটার ভেতর বেরিয়ে দেখতে গেলাম। আমার তখন এই কথাটাই সব চাইতে মনে হচ্ছিল যে, আমাদের দেশে বহুকাল আগে সমবায় দুগ্ধ ইউনিয়ন হয়েছিল। এখনও অবশ্য ঐ ইউনিয়নটি জীবিত। কলকাতার বউবাজারে তার অফিস। ১৯৩০ সালে কিছুদিনের জন্য সেখানে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন থেকেই একে দেখে আসছি। কিছুদিন পূর্বে আর একবার একে দেখার সুযোগ হয়েছিল শ্রদ্ধেয় পান্নাদার সৌজন্যে। দুঃখ হয় এত সুযোগ সুবিধা পেয়েও কেন এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের মধ্যে এই বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হয়ে গড়ে উঠল না। ভারত সরকার নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে, সমবায় প্রথায় ভারতের সব কিছু গড়ে উঠবে। এই সমবায় সংস্থাটি বহু দিনের কিন্তু এর উন্নতি তেমন হল না কেন? এই আনান্দের খাইরা দুগ্ধ কেন্দ্র ১২ বৎসর যার বয়স সে সারা ভারত-বর্ষের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। এমন কি 'আমুল' মাখনের নাম জানে না এমন লোক কমই আছে। কেন এমন হয় এই কথাগুলোই মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল—হঠাৎ স্ত্রীর কথায় চিন্তার তারটা ছিঁড়ে গেল। তিনি বললেন, 'দেখ কি সুন্দর কোয়ার্টারগুলি।' চিন্তা তখন বাধা পেয়ে—তার গতি ফিরিয়েছে অন্যদিকে। গাছে ঢাকা সুন্দর পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমরা আবার ফিরে এলাম আমাদের সেই গেস্ট হাউসে। এখান থেকে আমরা বরদা হয়ে বোম্বে যাব। বম্বের আরে দুগ্ধ কেন্দ্র

দেখার বাসনা আমার অনেকদিনের। আজই রাতে শিক্ষার্থীগণ রওনা হয়ে যাচ্ছেন আরে ভুঙ্ক কেন্দ্রে। তাঁদের মাধ্যমে আমাদের ওখানে পৌঁছানোর সময় ও তারিখের সংবাদটা পাঠিয়ে দিলাম। এই সব কাজ সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আহার পর্ব সমাধা করলাম। তারপর শুলাম। পরের দিন ছিল রবিবার। বেয়ারা যাবে চাচে, সেইজন্য সেদিন সবাইকে সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে নিতে হবে—তাই সকাল ৫॥ টায় চা আর ৭॥০ টায় ব্রেকফাস্ট শেষ করে রওনা হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিঃ ভাট্ ঠিক সকাল ৮।৩০ মিঃ সময় আমাদের স্টেশনে পৌঁছানোর জন্য গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। রওনা হলাম স্টেশনের পথে। আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে মিঃ ভাট্ বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন। আমাদের ট্রেন ছিল ৯টার পর। আমরা মালপত্র নিয়ে সোজা চলে এলাম স্টেশন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে। গাড়ি কিছু লেট্। স্টেশনে যাত্রীর ভিড় ছিল সেদিন অসম্ভব—আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে টিকিট পরিবর্তন করে আরামে বসবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। বেলা আন্দাজ ১০।৩০ মিঃ গাড়ি এসে দাঁড়াল বরদা স্টেশনে। আমাদের বম্বে যাওয়ার গাড়ি রাত্রি ১০টায়। অতএব, সময় হাতে প্রচুর। এই সময়ের মধ্যে আমরা একটি স্কুটার ভাড়া করে দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য রওনা হলাম। আমেদাবাদ থেকে বরদা ৬২ মাইল আর বম্বে থেকে ২২৫ মাইল প্রস্ফুটিত ফুলের বাগান প্রাসাদ ও ছায়ায় ঢাকা পথের অপূর্ব সমাবেশের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলাম। বরদার ছবির আর্ট গ্যালারী ও যাদুঘর দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। এখানে ভারতের ও পাশ্চাত্যের বহু অপূর্ব তৈলচিত্র আছে। শিল্পীর হাতের নিখুঁত তুলির টানে আঁকা ছবিগুলি দেখে তন্ময় হয়ে গেলাম। একটি সাদা পাথর থেকে তৈরী নগ্ন নারীমূর্তি দেখলে মনে হয় জীবন্ত—এই মূর্তি প্রথমে দেখলেই থমকে দাঁড়াতে হয়—

মনে হয় সামনে নগ্ন নারীমূর্তি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় চোখে পড়ে। এই সংগ্রহশালায় এ ছাড়া আরো অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিসও আছে। পশু-পক্ষীর বিভাগটিতে বহু রকমের মৃত পশু-পক্ষীকে এমনভাবে রাখা হয়েছে দেখলে মনে হবে তারাও যেন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহু কিছু মডেল ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরানো সামগ্রী এখানে রাখা হয়েছে। বরদা শহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গাইকোয়াড়ের প্রাসাদ দেখতে গেলাম। ইংরেজ ভারত ত্যাগের পর দেশ যখন ভারতবর্ষের জনসাধারণের হাতে এল তার কিছুদিন পর থেকেই এদের সমস্ত সম্পত্তি ভারত সরকারের হাতে পড়ল। তার পর থেকেই এঁদেরও জাঁকজমক্ অনেক কিছু কমে গেল। প্রাসাদ দেখলে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই এর সৌন্দর্য আর বোধ হয় কিছু থাকবে না। বরদার বিশ্ববিদ্যালয় বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথিতে সমৃদ্ধ। এখানকার গ্রন্থাগারের যশ ও সুনাম অনেকদিনের। এখানে একটি সুন্দর পার্ক আছে। সেখানে দেখলাম ছোট ছোট শিশুদের জন্য ছোট রেলগাড়ি। চার আনা দিয়ে টিকিট কাটলে ছেলেদের চড়িয়ে পার্কের চারিপাশ ঘুরিয়ে আনে। সেদিন রবিবার, ছুটির দিন এই শিশু রেল স্টেশনে বহু শিশু সমবেত হয়েছে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে। ট্রেন ছাড়বে বেলা ২টার সময়। আমরাও ঠিক সেই সময় এই আনন্দমেলা দেখার জন্য উপস্থিত হলাম। শিশুদের নিয়ে রেলগাড়িটি ছাড়ল—ছোট ইঞ্জিন তার সেই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বগিগুলোকে বেশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—আর গাড়ির ভেতরে শিশুযাত্রীদের উৎফুল্ল ও আনন্দ মন যেন উপচিয়ে পড়ছে। আমাদেরও মন ঐ সব শিশুমনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নেচে উঠল। শিশু মন ভোলানোর অনেক উপকরণও এখানে দেখলাম। স্টেশনে ফিরে এসে বিশ্রাম করতে হল অনেকক্ষণ, কারণ গাড়ি রাত্রি ১০টায়।

বোম্বের পথে এখান থেকে যে গাড়িটা সংযোগ করে দেওয়া হবে

তাতে দু'টা বসার আসন সংরক্ষিত করে নিলাম। রাত্রি প্রায় ৮টার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজেদের সেই বগিতে গিয়ে স্থানটি ঠিক করে নিলাম। গাড়ি ছাড়ার কিছু আগে ঐ বগির নির্দিষ্ট যাত্রীরা সব আসতে আরম্ভ করলেন। গুজরাটের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কয়েকজন এসে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁরা বড় ফ্লাস্ক থেকে বহুরকম সুগন্ধি যথা, দারুচিনি বড় এলাচ্ প্রভৃতি মেশানো গরম দুধ বার করে সেবনে প্রবৃত্ত হলেন। ঐ দুধের সুগন্ধ এত মনোরম যে এখনও মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হয়—গাড়ি এনে জুড়ে দিল অন্য একটি বগির সঙ্গে—গাড়ি অন্ধকারের মধ্যে ছুটে চলেছে বোম্বের পথে।

গাড়ির যাত্রীরা তখন সকলেই নিদ্রামগ্ন। আমরা কখন বা শুয়ে কখন বা বসে রাত্রিটা কাটিয়ে বড়িভল্লী স্টেশনে যখন পৌছলাম, তখন সকাল প্রায় ৭টা। এখান থেকে আমরা যাব আরে মিল্ক কলোনী। মালপত্র নামিয়ে স্টেশনের বাহিরে এসে অনুসন্ধান করে জানলাম যে, আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি এসেছে। গাড়িতে চেপে আমরা রওনা হলাম আরে মিল্ক কলোনীর পথে। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ভাবে পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী এই মিল্ক কলোনীটার শোভা মনোমুগ্ধকর। ঠিক যেন মনে হচ্ছিল "আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ" সেই রকমই পাহাড়ে হেলান দিয়ে গড়ে ওঠা এই মিল্ক কলোনীটি। বম্বের কাছাকাছি শহর। শীত-কাল হলেও শীত খুবই কম। আমাদের গাড়ি পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে এসে দাঁড়াল নিউজিল্যাণ্ড হোস্টেলে। আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য কর্তাব্যক্তিদের এক জন অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ওপরে নিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানি দেখিয়ে দিলেন। আমাদের সকালের চা ও জল খাবারের ব্যবস্থাও করে দিয়ে গেলেন। তৈরী হবার জন্য বলে গেলেন কারণ, আজই আমাদের এখানকার

কাজ কর্ম দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি বলে, চলে গেলেন। আমরা স্নানাদি ও চা পর্ব সেরে অপেক্ষা করছি এমন সময় তিনি গাড়ি নিয়ে এসে হাজির, আমরাও রওনা হলাম। তাঁকে প্রশ্ন করে এই হোস্টেলের ইতিহাস জেনে নিলাম। নিউজিল্যাণ্ড সরকার কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে এই হোস্টেলটি করে দিয়েছেন। এখানে যে সব ছাত্র আই. ডি. ডি ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করতে আসেন তাঁরা থাকেন। সত্যই এই অট্টালিকা অতি মনোরম। বহু ঘর এতে আছে। অধ্যাপকরাও এখানেই থাকেন। এখানে থাকার ব্যবস্থা খুবই ভাল। শুধু থাকার ব্যবস্থাটাই আছে। খাওয়ার জন্য আছে আলাদা ক্যান্টিন। ক্যান্টিনে সবই পাওয়া যায়।

আমাদের প্রথমেই যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো সেটি হচ্ছে ঐখানকার পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থান। সেখান থেকে এদের ২০০০ একর বিস্তৃত দুগ্ধ কলোনীর সবটাই দেখা যায়। সমস্তটাই কৃত্রিম হলেও এমন সুন্দর ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, দেখলেই মনে হয়—নয়ন সার্থক হলো। সামনে ফুটে আছে শীতের বহু রং বিশিস্ট মৌসুমী ফুল। পায়ের তলার ঘাসগুলো মখমলের মত। ঠাণ্ডা মৃদু হাওয়া— আমাদের রাত্রি জাগরণের যা কিছু ক্লান্তি সব দূর করে দিয়ে মনে সেদিন এনেছিল নূতন উদ্যম, উৎসাহ ও প্রফুল্লতা। এই অপরূপ পরিবেশটি হৃদয়ের সব-খানি জুড়ে বসে আছে।

সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা এলাম দুধের কারখানায়। যন্ত্রচালিত হয়ে দুধ ঢালা থেকে বোতলে ভরা পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। আনান্দেও এটা আমরা দেখে এসেছি। আমার জীবনে এ-কাজ দেখার অভিজ্ঞতা আছে। এগুলো দেখে সুধু যে আনন্দ পেলাম তা নয়। আমার ছাত্রাবস্থার স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিল। আমাদের সময় ডেয়ারীর যন্ত্রপাতির এত উন্নতি হয়নি। অন্য স্তরের বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডেয়ারীর উন্নতিও অনেক হয়েছে। আমরা আরে দুগ্ধ কেন্দ্রের কাজ

দেখে পাহাড়ের গায়ে এদেরই ক্যান্টিন-এ এলাম। কর্মকর্তা মহাশয় আমাদের স্নো-বল-আইস ক্রীম দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। আমরা সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে এই আরে দুগ্ধ কেন্দ্রের কাজ কর্ম বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করলাম। এই দুগ্ধ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে বম্বের দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। গরু-গুলো অস্বাস্থ্যকর ঘিন্‌জি নোংরা যায়গায় থাকত। বহু ভাল দুগ্ধবতী গাই প্রথম বাচ্চা হওয়ার পর নষ্ট হয়ে যেত। ভাল ভাবে যত্ন করে রাখার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বম্বে মিউনিসিপ্যালিটি অনেকদিন আগে থেকেই পরিকল্পনার মাধ্যমে দুধের সমস্যা সমাধানের প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে ১৭ই অগাস্ট সিভিল সাপ্লাই বিভাগ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন যুদ্ধের সময়—অসুবিধা ছিল অনেক। ভারতবর্ষও তখন পরাধীন—চলার পথে বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারা যায় নি। ১৯৪৫ সালে এই গ্রামে ১০০০ একর জমি সংগ্রহ করে সরকারের এই দুগ্ধ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন এখানে ছিল ১০০০ মোষ—দুধ হত ১০০০ পাঃ। বাঁকা দুধ "আনান্দ" থেকে আসত। তখন এখানকার পথ ছিল দুর্গম। আসা যাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল।

আরে দুগ্ধ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় ১৯৪৯ সালে। ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ উদ্বোধন করেন। বম্বে শহরে যে সব খাটাল ছিল—আর সেখানে যেসব গরু থাকত তাদের এখানে আনার ব্যবস্থা হয়। এতেও সরকারকে অনেক বেগ পেতে হয়। হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল এই পরিকল্পনাকে রদ করার জন্য। ১৯৪৮ সালে প্রায় ১৭০০০ হাজার মোষ এখানে আসে। এইভাবে এর ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠান ৪০০০ হাজার একর জমিতে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পদ্ধতিতে দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থায় রূপ লাভ করে। এখন এখানে ৫০০০ হাজার লোক কাজ করে। এই দুগ্ধ কেন্দ্রের ঘণ্টায় ৪০০০০ পাঃ দুধ প্যাস্‌টুরাইজ করার শক্তি আছে। ৪ লক্ষ ২৫ হাজার

বোতল দুধ ভর্তি করে বম্বে আসে। বম্বে শহরে কলকাতার মত অনেক দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র আছে। ৭২০০০ শিশু ছাত্রদের বিনা পয়সায় দুধ দেওয়া হয়। ৩০০টি হাসপাতালে দুধ এখান থেকে আসে। আমাদের মধ্যে যখন এই সব আলোচনা হচ্ছিল তখন দুগ্ধ কলোনীর কর্মকর্তা বলে ফেললেন, আমরা একদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলাম —বম্বে ও বৃহত্তর বম্বের সমস্ত লোকের মুখে দুধের বোতল তুলে ধরব। আজ এই উন্নয়নের দ্রুত গতি দেখে এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে আসছে যে, স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে বেশী দেরী নেই।

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, বহু দুগ্ধ কেন্দ্র দর্শনার্থী বাহিরে রোদে পিঠ দিয়ে কিছু না কিছু মুখে দিচ্ছেন। এখানে দর্শনার্থীদের দুগ্ধ কেন্দ্র দেখতে হলে চার আনা দর্শনী দিতে হয়। এতে শুনেছিলাম বাৎসরিক বহু টাকা আয় হয়। দর্শনার্থীদের বসার বা বিশ্রামের স্থানটি অতি মনোরম। আমরা ফিরে এলাম হোস্টেলে। এবং হোস্টেলের ভেতরের ক্যান্টিনে আমরা মধ্যাহ্নের আহার সেরে নিলাম।

ক্যান্টিনের পাশে একটি অতি অপূর্ব সুসজ্জিত লাউঞ্জ আছে। সেখানে অনেকে এসে বসেন ও নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেন। একদল ছাত্র এসে আমাদের কাছে বসে প্রশ্ন করল—আপনারা এখানে কি ব্যাপার? উত্তরে জানালাম—আমরা নবভারতের সৃষ্টিযজ্ঞের দর্শনার্থী। বললাম ৩০ বৎসর আগে আমিও আপনাদের মত এই পথের একজন ছাত্র ছিলাম। তখন জনচক্ষে এর পরিচিতি ছিল খুব কম। আমি ব্যাঙ্গালোরের ছাত্র ছিলাম। গল্প জমে উঠলো। বর্তমানের ডেয়ারী শিক্ষার নবপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা হল। ছাত্ররা এই নিউজিল্যাণ্ড হোস্টেলেই থাকেন। বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম আমাদের ঘরে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার আমরা দেখতে গেলাম

Cattle shed ও মহিষের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী। ফার্মের সমস্ত খুঁটি-নাটি আমাদের দেখিয়ে কর্মকর্তা নিয়ে গেলেন এখানকার গেস্ট হাউসে। সত্যই গেস্ট হাউসটি অতি মনোরম। পাহাড়ের উঁচু যায়গায় মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত এই বাড়ি। সামনের বাগানে ভেলভেটের মত ঘাসের ওপর অপূর্ব ফুলের শোভা। সূর্যদেব তখন ঢলে পড়েছেন পশ্চিমে। তাঁর সেই আলোর স্বর্ণাভ রং ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত বাগানটিতে। কর্মকর্তা ফেরার পথে তাঁর বাড়িতে আমাদের চা-পানের আমন্ত্রণ জানালেন। মন তখন দৃশ্যের সৌন্দর্যে ভরপুর, গলা কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। গাড়ি পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে এসে আবার উঠল খানিকটা উঁচু পাহাড়ে—আমরা এসে নামলাম কর্মকর্তার বাসায়। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন।

গুজরাটের প্রথানুযায়ী অবশ্য আমাদের দোলনায় দোল খেতে হয় নি। বাড়ির সামনের বাগানে আমরা বসলাম। মনের কথার আদান-প্রদান করতে করতেই চা আর তার সঙ্গে কিছু ভাজা এসে গেল। চায়ের মজলিশ তখন বেশ জমে উঠেছে। প্রথমেই শুকনো গলাটাকে ভিজিয়ে নিলাম—তারপর দু একটা ভাজাও মুখে দিলাম আদর আপ্যায়নে ও অমায়িক ব্যবহারে মোহিত হয়ে গেলাম।

গাড়ি আমরা আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। পায়ে হেঁটে নামছি—এমন সময় বাংলা কথার আওয়াজ কানে গেল। কিছুটা গিয়েই দেখি একজন ভদ্রমহিলা পাহাড়ের একটি চালায় বসে আছেন। আর একটি ছোট মেয়ে খেলা করছে সামনে। আমাদের দেখেই তিনি উঠে এলেন। আমার স্ত্রী তাঁর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলেন। তিনিও কিছুতেই ছাড়বেন না—যেতেই হবে তাঁর ওখানে, বিদেশে বাঙালী দেখে আমাদেরও ভাল লাগল, আমরা গেলাম তাঁর বাসায়। বাসাটি ছোট হলে কি হয়, বেশ পরিপাটি করে সাজানো। তাঁর কর্তা তখন বাইরে—আলাপ হল না তাঁর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ গল্প করে সময় কাটিয়ে ফিরে এলাম আস্তানায়। স্নানাগারে ঠাণ্ডা ও গরম জলের প্রাচুর্য দেখে শীতকাল হলেও স্নান করে শরীরটাকে ক্লান্তি মুক্ত করে নিলাম। যৎসামান্য কিছু আহার করে যখন ঘরে ফিরছি তখন সেই বাঙালী ভদ্রলোক সামনে এসে হাজির। আপনারা যখন আমার বাসায় গিয়েছিলেন তখন আমি ছিলাম না—বাসায় গিয়ে খবর পাই—যে আপনারা এসেছিলেন—দেখা করতে এলাম, শুধু তাই কেন—আপনারা বাঙালী, ভাল ভাবে যাতে পরিচয় হয় তার জন্যই এলাম। আজ সকালেই অফিসে শুনেছি আপনারা এসেছেন। আমন্ত্রণ জানালেন পরের দিন তাঁর ওখানে আহারের জন্য। কিন্তু পরের দিনই সকালে আমরা চলে আসছি বম্বে। সেই জন্য তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না।

সকালে উঠে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। গাড়ি ঠিক সময় মত এসে গেল আমাদের বম্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ফোন করে বম্বের একটি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। আরে মিল্ক কলোনী থেকে বম্বে প্রায় ২০ মাইল পথ। আমরা পথে বৃহত্তর বম্বের অনেকগুলি শহর দেখতে দেখতে চলে এলাম হোটেলে। আমাদের হোটেল, বম্বের এপলোবন্দর, ভারতের স্বনামধন্য তাজমহল হোটেলের কাছে। মালপত্রগুলো হোটেলে নামিয়ে রেখে গেলাম সরকারী দপ্তরে বম্বের মিল্ক কমিশনার শ্রীথুরুড়ি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। আলাপ পরিচয়ে জানতে পারলাম তিনি ব্যাঙ্গালোর থেকে আমাদের আগের বছরে পাস করেছেন। একই শিক্ষালয়ের ছাত্র বলে আমাদের আলাপ আলোচনাটা জমে উঠেছিল বেশ। আরে মিল্ক কলোনী কেমন দেখলেন প্রশ্ন করলেন তিনি। অতি সুন্দর। এক কথায় এর চেয়ে আর ভাল করে প্রকাশ করা যায় না—হাসতে হাসতে থুরুড়ি সাহেব বললেন, কয়েক বছর যথেষ্ট পরিশ্রম করে আজ এই অবস্থায় একে আনতে পেরেছি।

আলোচনার মধ্যে আমাদের অধ্যাপক ডাঃ কোটাওয়ালার

কথা উঠে পড়ল। খুরুড়ি সাহেব জানালেন যে, তিনি এখানেই আছেন। আজই "ডেকান কুইন"-এ পুণা হয়ে ব্যাঙ্গালোর চলে যাবেন। আপনি দেখা করতে চান তো ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে সময় মত গেলেই দেখা হবে।

ফিরে এলাম হোটেলে। মধ্যাহ্নভোজনে বসে দেখলাম, আহারের ব্যবস্থা ভারতীয় ও বিলিতী দুই রকম—যার যেটা ইচ্ছা খেতে পারেন। ডাইনিং হলটি সরগরম। কাঁটা চামচের আওয়াজ আর বেয়ারাদের ছোটাছুটিতে মুখর হয়ে উঠেছে। পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার সেরে বম্বের বাজারে বেড়াতে গেলাম।

বম্বের ক্রফোর্ড বাজার দেখার মত। সুপ্রশস্ত রাজপথ অসংখ্য বিপণি আর শ্রেণীবদ্ধ সৌধাবলী এেকে আরো মনোরম করে তুলেছে। শোনা যায় এই বাজার পৃথিবীর সুন্দর বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম। বাজারের কাছেই আছে ক্লক টাওয়ার। আর্থার ক্রফোর্ড সি. এস মহোদয়ের নামে এর নামকরণ হয়েছে। তিনি বম্বে মিউনি-সিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। আভ্যন্তরীক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখবার মত। আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে বাজারটি দেখলাম। তার পর ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে এলাম আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভের জন্য।

স্টেশনের গগনস্পর্শী চূড়া দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। আমার পূর্বে বহুবার বম্বে দেখার সুযোগ হয়েছিল। স্টেশনে প্রবেশ করেই লক্ষ্য করলাম—জনস্রোতের কোলাহল, যাত্রীদের ব্যস্ততা—মাঝে মাঝে বাঁশীর আওয়াজ, এই সব মিলে স্টেশনটিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। ছুটে চলেছে যাত্রীরা, ডেকান কুইন ছাড়বে যে প্ল্যাটফর্ম থেকে সেই দিকে। নিজেদের বগিতে উঠে যায়গা করে বসে পড়ছে। এই ডেকান কুইন্ ভারতে নাম করা গাড়ি। আগে এর সৌন্দর্য ছিল আরো মনোরম। তিন ঘণ্টায় বম্বে থেকে পুণা যায়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এর যাত্রী হন।

বসে বসে ভাবছি দেখা করতে এলাম—চিনতে পারব তো। ২০ বৎসর আগে এমনই হঠাৎ ট্রেনের ডাইনিং-কারে কিছুক্ষণের জন্য একবার দেখা হয়েছিল। এই ক' বৎসরে তাঁর না জানি দেহের কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এমন সময় দেখি প্রায় ঠিক তাঁর মতন দেখতে একটি পার্শী ভদ্রলোক তাঁর মালপত্র ট্রলিতে চাপিয়ে এগিয়ে আসছেন। মনে বল করে সাহস নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ডাঃ কোটাওয়ালা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, তুমি বাগ্‌চী না— আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।—হ্যাঁ স্যার। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এই সময় স্টেশনে এসেছি। আজই সকালে মিঃ খুড়ড়ির কাছে জেনেছি যে আপনি এই ট্রেনে ব্যাঙ্গালোর যাবেন। আপনার দর্শন লাভের এই সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা নেই বলেই ছুটে এসেছি স্যার। একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম চোখ দুটো ভিজে ভিজে—আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলেন, লাইনের কাজ না করে সেই রাজনীতিই করছ বোধ হয়। তোমার ওপর আমার একটা আশা ছিল—ডেয়ারী লাইনে থাকলে অনেক ভাল কাজ করতে। স্বাধীন ভারতের তোমার দ্বারা অনেক উপকার হত। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তাঁকেও সেই এক কথাই বললেন। বাগ্‌চী ভুল করেছে, ডেয়ারী লাইনে থাকলে বেশ ভাল ভাবে দেশ-সেবা করতে পারত। ব্যাঙ্গালোর যাও তো আমার ওখানে উঠো। অনেক সতীর্থের খবর জেনে নিলাম। গাড়ি ছাড়ার সময় হতেই নেমে পড়লাম তাঁর বগি থেকে।

ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিয়ে আবার সেই স্টেশনের কোলাহলের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেললাম। অগণিত যাত্রীদের কাটিয়ে স্টেশনের বাহিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর একখান ট্যাক্সী পেলাম, রওনা হলাম আমাদের সেই "স্ট্রাণ্ড"

হোটেলের পথে। সারা পথটা দেখতে দেখতে এলাম প্রাসাদ পূর্ণা নগরীর রূপ। শোনা যায় মুম্বাই দেবীর নাম থেকে এই শহরের নাম বম্বাই হয়েছে। এই কথাও কিংবদন্তী আছে যে পর্তুগীজরা এই সুন্দর শহর দেখে নাম করণ করেছিল। এই সব কথা যখন মনে উদয় হচ্ছে, গাড়ি তখন ছুটে চলেছে ফ্লোরা ফাউণ্টেনকে পাশে রেখে এপলোবন্দরের দিকে। সর্বজনবরেণ্য নেতা দাদাভাই নৌরজীর মর্মরমূর্তি দেখে নিলাম। গাড়ি একেবারে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার সামনে এসেই ডান দিকে কিছুটা পথ গিয়ে হোটেলের গেটের মধ্যে প্রবেশ করল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে নিজেদের ঘরে চলে গেলাম।

সমস্ত দিনই ঘোরাঘুরি চলছিল, শরীরটাও বেশ কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিশ্রাম নিলাম অল্পক্ষণ। স্নান সেরে ধোপদোরস্ত হয়ে রওনা হলাম মালাবার হিলসের দিকে। তখন বিজলী আলোয় ঝলমল করছে সমস্ত রাস্তা, তার মধ্যে মেরিন ড্রাইভের পীচ ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটছে। নয়নমুগ্ধকর বম্বে নগরীর এই পথ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গিয়েছে এর একদিকে মালাবার হিলস্ অন্যদিকে কোলাবা। এই প্রশস্ত পথকে মেরিন রোড বলে। বর্তমানে এর নাম দেওয়া হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড। এর একদিকে সমুদ্রের খাড়ি অপর দিকে আকাশচুম্বী প্রাসাদ। এই পথের মধ্যে দিয়ে গাড়ি উঠলো মালাবার হিলস্। সমুদ্রের ধার বেয়ে উঠেছে এই ছোট পাহাড়। পাহাড়ের ওপর ফুলের বাগান। কমলা নেহরু পার্ক। নানা রং-এর ফুলের শোভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। কৃত্রিম ঝরণা আর তার পর আছে একটি পোল। এরই পাশে আছে একটা জুতোর ধাঁচে দোতলা বাড়ি—নাম তার "ওল্ড লেডিজ্ স্যু" বুড়ীর জুতো।

মালাবার হিলসের পাশে ফিরোজ-সা মেটা নামে আর একটা পার্ক আছে—যার নাম ছিল ঝুলান বাগান। বাগানের সামনে

ফিরোজ সা মেটার মর্মর মূর্তি। এই পাহাড়ের ওপর অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির আবাস আছে। এখানে বাসে করেও আসা যায়। আমরা ফেরার পথে বাসে ফিরলাম – মন্দ লাগল না। যাত্রীরা এখানে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যায় না। সারি বন্দী হয়ে বাস স্টপে দাঁড়াতে হবে আর নিয়ম মত পরপর উঠতে হবে। নির্দিষ্ট আসন বোঝাই হলেই আর কাউকে উঠতে দেবে না। মহিলাদের কোন আলাদা আসন নেই।

হোটেলে ফিরে এসে আহার শেষ করে,—হোটেলের সামনে সমুদ্রের ধার দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে বেড়াতে গেলাম। কিছুটা গিয়েই বাঁয়ে তাজমহল হোটেলের বিরাট অট্টালিকা—ভেতরে প্রবেশ করলাম। মনে হল ঠিক যেন জনবহুল একটা শহর। দোকান-পাট সবই আছে। টুরিস্ট অফিস। টমাস কুকের অফিস আছে। অজন্তায় যেতে হলে সুবিধা পথ কোনটা জানবার জন্য টুরিস্ট অফিসে ঢুকলাম। কর্তা ও কর্ত্রীগণ নিজেদের মধ্যেই কথা বলায় ব্যস্ত। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। চোখ আর আমাদের দিকে ফেরে না। মাপ করবেন, ২।৪ বার এর মধ্যে বলা হয়ে গিয়েছে, তবুও গল্প তাঁদের চলছিল। এইভাবে কিছু সময় কেটে যাওয়ার পর আড় চোখে আমাদের দিকে চেয়ে একজন ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন—কি চাই? আমি জানালাম—অজন্তার জলগাঁও হয়ে যাব না মানমাদ হয়ে যাব? তিনি বললেন, আপনাদের ১ম শ্রেণী বা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে রিসার্ভেশন আছে? আমি বললাম—তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমরা। ভাব এমন দেখালেন যেন আমরা খুবই দুঃসাহসিকতার কাজ করেছি—এই হোটেলে ঢুকে এই সব প্রশ্ন করে। আমার মেজাজটা তখন একটু গরম হয়েছে—বলে ফেললাম আপনারা কি শুধু ঐ সব শ্রেণীর টাকায় চাকরি করেন না সমস্ত ভারতবাসীর টাকায়? আরো বললাম, আমি যে ক্লাসেরই

যাত্রী হই না কেন আপনাকে পরিষ্কার করে আমায় অজান্তার সহজ পথ বাতলাতে হবে। মেয়েদের সাজ পোশাকের দিকেই নজর বেশী বলে মনে হল। কিছুটা কথা কাটাকাটি চলল। পরে আমার ওপর নির্দেশ হল যে, জলগাঁও হয়ে যাওয়াই সুবিধে। তাজ হোটেলের গরম হাওয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের পবিত্র হাওয়া খেয়ে মনটা কিছুটা সুস্থ হলো। বার বার মনে হতে লাগল—সমাজতন্ত্র ধাঁচে রাষ্ট্র গঠনের কথা। এদের দৃষ্টিকোণ না বদলালে সরকারের নীতি যে সফল হবে না—সে বিষয় সুনিশ্চিত।

দু পা এসেই সামনে দেখলাম গেট ওয়ে অব ইণ্ডিয়া—১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর শুভাগমনকে স্মরণ করার জন্য সমুদ্রের তলদেশ থেকে গেঁথে তোলা হয়েছে এই ভারতের প্রবেশ দ্বার।

সামনে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। নীল জলরাশি নীলিমার সঙ্গে মিশে অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করেছে। সমুদ্রের তীর প্রস্তর নির্মিত। সিঁড়িগুলো পাথর দিয়ে শক্ত করে তৈরী—দেখলে প্রশংসা না করে পারা যায় না। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া আর সামনের অপূর্ব সৌন্দর্য মন প্রাণকে সজীব করে তুলেছিল। একটা বেঞ্চে অনেকক্ষণ বসে এই সৌন্দর্যের রস ও রূপ দুইই উপভোগ করলাম। হোটেলে যখন ফিরলাম রাত তখন অনেক।

বেয়ারা চায়ের ট্রে হাতে ডাক দিতেই ঘুম ভেঙে গেল—দরজা খুলে দিলাম। চায়ের সঙ্গে বড় বড় কলা। মনে হল সকালেই কলা দেখালে—না জানি দিনটা কেমন যাবে। আমাদের ধারণা চায়ের সঙ্গে কলা খেলে শরীর খারাপ হয়—কদিন খেয়ে দেখলাম—ভালই হল। এই প্রথাটি আজকাল ইংরাজী কায়দায় হোটেলে প্রচলিত। স্নান পর্ব সেরে প্রস্তুত হয়ে নেমে এলাম খানা-ঘরে প্রাতরাশের আশায়। টেবিল তখন সব সাজান হয়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট আসনে

বসে পড়লাম। প্রাতরাশের আয়োজন বেশ ভালই ছিল। শেষ করে—বম্বের দর্শনীয় যা কিছু আছে দেখার জন্য রওনা হলাম।

কিছুটা পায়ে হেঁটে, কিছুটা ট্রাম, কিছুটা বাসে করে—যাদুঘর, চিত্রশালা, চিড়িয়াখানা, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়াম দেখে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন বেলা হয়েছে বেশ। সূর্যরশ্মির ছটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসকে অপূর্ব রূপায়িত করেছে—মনে হচ্ছে সৌন্দর্য উপচে পড়ছে। শীতের দুপুর সমুদ্রের তীর স্নিগ্ধ মনোরম বাতাস শরীরের ক্লান্তি দূর করে দিয়ে মনে এনে দিল শক্তি। হোটেলে এদিকে খানা তৈরী। পেটে ক্ষুধার জ্বালা। মনকে জোর করে ছিনিয়ে এনে স্যুপের প্লেটে চামচ ডুবিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—এবার কোথায় যাবে? উত্তরে স্ত্রী জানালেন বাকীগুলো দেখে নিয়ে চলো পুণার দিকে রওনা হই। আহার সেরে লারসনটুব্রুর প্রতিনিধি একজনকে ফোন করলাম। "আনান্দে" ডেয়ারী ফার্মে এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ফ্যাক্টরী দেখার জন্য। উত্তরে জানালেন, অপেক্ষা করুন—গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুইজন প্রতিনিধি সহ গাড়ি এসে হাজির। আমরা রওনা হলাম ফ্যাক্টরীর দিকে। বম্বে থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে এই ফ্যাক্টরী। আমরা পৌঁছতেই সাদর আহ্বানে আমাদের গ্রহণ করলেন। ফ্যাক্টরীর সমস্ত কাজকর্ম আমাদের দেখালেন। ডেয়ারীর সমস্ত রকম যন্ত্রপাতি এঁরা তৈরী করেন। তা ছাড়া বিজলী আলোর যন্ত্রপাতিও এখানে তৈরী হয়। মেয়ে পুরুষ মিলে অনেক কর্মী এখানে কাজ করেন। কিছুক্ষণ পর আমরা ফিরে চললাম আরে মিল্ক কলোনীর দিকে—আমরা জনবিরল নির্জন পথে আঁকা-বাঁকা এক আধটু চড়াই পার হয়ে চলে এলাম "পোয়াই লেক";—বম্বে থেকে ২৫ মাইল দূরে। এখানে ছুটির দিনে খুব ভিড় হয়। বহু বম্বেবাসী এখানে চড়ুইভাতি করতে আসেন। প্রকৃতির

অপূর্ব শোভা দেখলাম। এই লেকে জলবিহারের ব্যবস্থাও আছে। এক মাইল দূরে "বিহার লেক"। বম্বে নগরীতে যেমন লেক আছে তেমনি বহু প্রাচীন যুগের অনেক গুহাও আছে। আমাদের ড্রাইভারটি প্রস্তাব করলেন, চলুন দেখে আসবেন কাছেই জাতীয় উদ্যান আর কানেরির চৈত্য বা কানেরির বিহার। সে বললে যে, হীনযান সম্প্রদায়ের শেষ চৈত্য মহিমাময় মূর্তিতে পশ্চিম-ঘাট শৈলমালার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে প্রায় ১৩২টি গুহা আছে। স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তৈরী। ধর্ম-চর্চার আর শিল্প-চর্চার সমন্বিত রূপ।

বম্বে শহর থেকে প্রায় ১৯ মাইল দূরত্ব। বড়িভিলি স্টেশন থেকে এখানে আসা যায়। হাতে আমাদের সময় ছিল না—যাওয়া আর সম্ভব হল না। আমরা বম্বের অনেক কিছু গল্প শুনতে শুনতে চলে এলাম বম্বের বিমান বন্দর "সান্তাক্রুজে।" সেখান থেকে কিছুটা গিয়ে নারিকেল বীথি-বেষ্টিত পথে চলতে শুরু করলাম। বহু মধ্যবিত্ত ও ধনীর বাসগৃহকে পাশে ফেলে চলে এলাম জুহু সমুদ্রসৈকতে।

উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে ভীষণ গর্জনে ছুটে আসে আরব সাগর। গতি তার বিরামহীন। বহু লোক জমায়েত হয়েছে। কেউ বা স্নানের জন্য। কেউ বা উন্মুক্ত আরব সাগরের নীল জলরাশির শোভায় স্নাত হচ্ছে। ফুচকা ভাজা-ভুজিও কিনে খাচ্ছে অনেক লোক। সূর্যদেব তখন পাটে বসেছেন—ঠিক সোনার একখানি থালা। বিচ্ছুরিত স্বর্ণাভ কিরণে সমুদ্রের নীল জলরাশি আপ্লুত। অপূর্ব তার শোভা।

আমরা বম্বের অন্তর্গত বৃহত্তর বম্বের শহরগুলি দেখতে দেখতে চলেছি। জনসমুদ্র তখন বাড়ি ফিরছে নিজ নিজ কাজ সেরে। সমস্ত পথ যেন জীবন্ত ও মুখর করে তুলেছে। এখানেও সেই একই প্রশ্ন, বিরাট প্রাসাদের গায়ে মাঝে

মাঝে বস্তির নগ্ন রূপ। পীচ ঢালা পথ দিয়ে মোটর গাড়ির সারি চলেছে, ধোপ দুরস্ত পোশাক-পরা পার্শি, হিন্দু বহু জাতির মানুষ চলেছে। সকলকেই কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সামনে ফুল ভরা পার্ক। তাকেও পাশে ফেলে চলেছি। মলিন বেশধারী জনতাও এদের গা ঘেঁষে চলেছে। সৌন্দর্যের পাশে এই দারিদ্র্যের কালিমা। চোখের দৃষ্টি ও মনের ঘুরপাকের তখন লড়াই চলেছে। গাড়ির গতি কখন মন্থর, কখন বা দ্রুত। চলে এসেছি সেই জায়গায় যেখান থেকে জাহাজ পাড়ি দেয় বিলাতের পথে। অনুমতি না নিলে সব সময় প্রবেশ করা সম্ভব নয়। বাইরে থেকেই দেখে বিলাত যাত্রার সূচনার সুখ ভোগ করে নিলাম। সেখান থেকে আলোক উজ্জ্বল মেরিন ড্রাইভের পথ দিয়ে চলে এলাম ঝোলান বাগানে। চালক এখানকার সব পথ ঘাট ভাল ভাবেই জানে। এমন একটি পয়েন্টে গাড়ি দাঁড় করাল যেখান থেকে বম্বে শহরের একটা অংশ সন্ধ্যায় মনে হয় ঠিক যেন "রাণীর গলায় হীরা জহরতের হার" – একেই নাকি বলে "কুইন্স নেকলেশ।" আগের দিন এসে ঠিক করতে পারিনি স্থানটি। কিছুক্ষণ সৌন্দর্য উপভোগ করে ফিরে এলাম আস্তানায়।

মুখ হাত ধুয়ে ডাইনিং-হলে ঢুকলাম। কয়জন বাঙালী দেখলাম আর একটি টেবিলে বসেছেন। আহারের পর আলাপ হল। তারা এসেছেন সিনেমার কোন একটা বই তুলতে। হোটেলের বাইরে এসে সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে শরীরটাকে ধাতস্থ করে নিলাম। পরের দিন সকালে উঠে এলিফ্যান্টা যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে স্টীম লঞ্চের টিকিট কাটতে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার ধারে গেলাম। টিকিট পাওয়া গেল না। আমি অনেকবার বম্বে এসেছি—এলিফ্যানটা আমার দেখা। আমার স্ত্রীর দেখা হল না। তিনি পরে যেতে রাজী হলেন না। বম্বে বন্দর থেকে ৬ মাইল জল পথে এলিফ্যান্টা দ্বীপ। সুবিশাল

হস্তি মূর্তি দ্বীপের নীচে, তাই এলিফ্যান্টা নামে খ্যাত। শোনা যায় অজন্তা-ইলোরার মত এই দ্বীপের পার্বত্য গুহাতেও বৌদ্ধ শ্রমণেরা অনেক সময় বাস করতেন। তাঁদের হাতের অস্ত্র আর চোখের শিল্পদৃষ্টি জনমানবের অজ্ঞাতসারেই নিটোল পাথর কেটে তৈরী করেছে বিভিন্ন মূর্তি। অধিকাংশ মূর্তিই বৌদ্ধ ও শৈবদের যুগ্ম পরিকল্পনাজাত।

এই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের গুহাভ্যন্তরে রয়েছে বিরাট অবলোকিতেশ্বর মূর্তি, যাত্রী মূর্তি বলে খ্যাত। স্বল্লায়ত প্রতিচ্ছবি স্বাধীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ ডাকটিকিটের ওপর আজ শোভা পায়। এই এলিফ্যান্টাকে ঘিরে কত কথাই না মনে হতে লাগল। আমি যখন গিয়েছিলাম সে হবে ১৯২৮ সাল। নৌকায়। উত্তাল তরঙ্গের মাঝে নৌকার সেই দোলানী আজ এখানে দাঁড়িয়েই বেশ অনুভব করতে পারছি। নিরাশ হয়ে ফিরে এসে—প্রস্তুত হয়ে নিলাম পুণার পথে রওনা হওয়ার জন্য।

ট্রেন সকাল ৯।৩০ মিঃ। হোটেলে ফিরে মালপত্র গুছিয়ে নিলাম। টাকাকড়ি সব মিটিয়ে দিয়ে চলে এলাম "ভিক্টোরিয়া টারমিনাস" স্টেশন। অতিরিক্ত মালপত্র রেলের অফিসে রেখে দিলাম। প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই দেখি ট্রেন এসে গিয়েছে। আগে থেকেই আমাদের টিকিট কাটা। একটা তৃতীয় শ্রেণীর বগিতে উঠলাম। বিজলীর মিস্ত্রীরা সব বগিগুলিতে উঠে গাড়ির আলো ঠিক আছে কিনা দেখে গেল—যেটার ঠিক নেই বদলে দিয়ে গেল, কারণ গাড়ি মাঝে মাঝে ট্যানেলের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যাবে। আমাদের বগিতে যাত্রীর সংখ্যা কমই ছিল। ট্রেন ছেড়ে একটার পর একটা স্টেশনকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে পুণার দিকে আমরা দাদার, কল্যাণ, বৃহত্তর বম্বের শহরগুলি পার হয়ে চলেছি। আমাদের বগিতে রয়েছেন দুজন বিদুষী মহিলা—মনে হয় বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ; পুণায় শিক্ষিকার কাজ করেন। পরিচয় হল।

তারপর শুরু হল পুণার ইতিহাস। বললেন—পুণা এখান থেকে ১১৯ মাইল। এই ট্রেন আগে ছিল না—তখন যাতায়াতের খুবই কষ্ট ছিল। ১৮৬০ সালে এই রেলপথ তৈরী হয়। আলোচনা চলতে চলতে দুধারে পাহাড়ের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। পারিপার্শ্বিক অপূর্ব দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। ঝরণা-গুলো প্রায় সব শুকনো। বর্ষাব জলধারা যখন নামে তখনই এই ঝরণাগুলো হয়ে ওঠে জীবন্ত ও মুখর। বিজলী শক্তি টেনে নিয়ে যাচ্ছে এতবড় ট্রেন। কখন সর্বোচ্চ শিখরে উঠছে আবার মুহূর্তের মধ্যে নেমে আসছে নীচে। দৃশ্যের সৌন্দর্যে মন যখন ভরপুর তখন আমরা অনেকগুলো ট্যানেল পাব হয়ে এসেছি। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৯টা ট্যানেলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি যায়। যদিও শীতকাল তবু পাহাড়ের গায়েব গাছপালাগুলো জীবন্ত ও সবুজ ঘাসে-ঘেরা। মন লাটাইয়ের সুতো চলে গেছে তখন অনেক দূর—।

মহিলা বললেন, মারাঠা জাত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর জাত। ছত্রপতি শিবাজী ১৭শ শতাব্দে মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সেই সময়। শিবাজীব আদিপুরুষ যোদ্ধা ছিলেন। আদিপুরুষের জন্ম চিতোর দুর্গে। শিশোদীয় রাজপুত-প্রতিভায় প্রতিভাবান এই জাত। শিবাজীর মধ্যেও এই প্রতিভার অভাব ছিল না। জীজাবাঈকে যখন শাহ্‌জী পথে ফেলে যান—জীজাবাঈ তখন অন্তঃসত্ত্বা। জীজাবাঈ-এর পিতা যাদবরাও গর্ভিণী কন্যাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেন সিউনারী দুর্গে। বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া, বৃহস্পতিবার, ভারতের ভূমিতে শ্রেষ্ঠতম বীর ভূমিষ্ঠ হন। নাম রাখা হয় দুর্গাধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নামে।

আর একজন পাশে বসে ছিলেন তিনি প্রশ্ন করলেন,—তা হলে কি শাহ্‌জীর আর জীজাবাঈ-এর মধ্যে মনোমালিন্য ছিল।

—হ্যাঁ ছিল বৈকি। পরে তিনি বিবাহ করেছিলেন।—বলেই বললেন, যাক দু রকমই আপনাদের জানাচ্ছি।

শাহ্‌জী জীজাবাঈকে শিবনের দুর্গে রেখে বিজাপুর যান। ১৬৩০ সালে বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া, বৃহস্পতিবার, ভারতের অন্যতম বীর শ্রেষ্ঠ ছত্রপতি শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর মাতা ও পুত্রকে এই দুর্গে কাটাতে হয়েছিল। শিবাজী জন্মানোর বহুদিন পূর্বে মালোজী দেখেন তাঁর সামনে দিব্যজ্যোতিঃ অষ্টভুজা ভবানী-মূর্তি—দেবী বলেন ভয় নেই, তোরই বংশে দেবাদিদেব মহাদেব অবতীর্ণ হবেন। স্বরাজ্য ও স্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। আরো বলেন যে, সামনের ঐ জায়গার ভেতর বহু ধন-রত্ন আছে খুঁড়ে নিস। হলও তাই, পেলেন প্রচুর টাকা। নাতিও জন্মাল। নামও রাখা হল দুর্গাধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নামে। বালক কালে শিবাজী জাওলীদের সঙ্গে খেলাধুলা করে কাটাতেন। লেখাপড়ার দিকে কোনই ঝোঁক ছিল না। সেখানে তাঁর শিক্ষাগুরু দাদাজী তাঁকে অস্ত্রশিক্ষা সামরিক শিক্ষা ও বহুমুখী শিক্ষা দিতে থাকেন। এই-ভাবে তিনি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠে একদিন সমগ্র মারাঠার অধীশ্বর হন। আজও আমরা এই বীর যোদ্ধা দেশ-প্রেমিককে স্মরণ করি। আপনারা চলেছেন সেই শিবাজীর স্পর্শ-ধন্য পুণায়। এই সময় আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—আমরা নেরোল এলাম। এখান থেকে মেরাথন যেতে হয়। ১৩ মাইল দূর। পাহাড়ের ওপরে ছোট শহর। সুন্দর আবহাওয়া। ঐ দেখুন ছোট রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খেলাঘরের রেলের মত দেখতে। ঐ গাড়ি করে যেতে হয়। এই বোম্বে প্রদেশে খাণ্ডালা লোনাভেলা এমনই আরো দুটো ছোট হিল স্টেশন। বোম্বে ও পুণা দুই দিক থেকেই যাওয়া যায়। মোটরে যাওয়ার অতি মনোরম দৃশ্যাবলী শোভিত একটা রাস্তা আছে। বাসও যাতায়াত করে।

গল্প শুনতে শুনতে আমরা তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় আসতেই মনে হল ক্ষিদে পেয়েছে। সঙ্গে কিছু ফল ছিল আরো কিছু কিনে নিয়ে জলযোগ সেরে নিলাম। আমরা যখন পুণায় এসে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় ৩টা। মালপত্র নিয়ে স্টেশনের সামনে "ড্রীম ল্যাণ্ড" হোটেলে উঠলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলাম। হোটেলের ম্যানেজার মহাশয়ের সাহায্যে মহাবালেশ্বর যাওয়ার ছুখানা টিকিট ও পরের দিন শৌখীন বাসে পুণা শহর দর্শনের জন্য ছুখানি টিকিট কাটানোর ব্যবস্থা করে শহরের আশপাশ পায়ে হেঁটে বেড়াতে গেলাম। শহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রে ফিরে এলাম। পরের দিন সকালে ৮টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে স্টেশনের সামনে থেকে শৌখীন বাস ধরলাম। এদের ব্যবস্থাও ভাল। বাসে করে আমরা পুণার সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলো দেখলাম। পার্বতী মন্দির দেখলাম। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যেতে হয়। বাদ বাগান শম্ভুজী পার্ক, সানওয়ারডা পার্ক—এর প্রবেশ দ্বারের দরওয়াজায় লোহার পেরেক মারা আছে। এ ছাড়াও কৃষি-শিক্ষার মহাবিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জাতীয় কেমিক্যাল ল্যাবরেটারী দেখলাম। দেখে যখন ফিরলাম তখন বেলা ১২টা। আমাদের মহা-বালেশ্বরের বাস ছাড়বে বেলা ১।৩০ মিঃ। হোটেলে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাস স্টেশনে এলাম। বাসে লোক বেশ ভালই হয়। শীতের দিন হলেও দুপুরের রৌদ্রের তাপে বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। ৭৫ মাইল পথ আমাদের এই বাসে যেতে হবে। বাস কিছুদূর এসেই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল। একটা অংশ পাহাড় বেয়ে নেমে এল সমতল জমিতে—আবার হল পাহাড়ে ওঠা শুরু। আমাদের পাশের সীটে একজন অধ্যাপক কয়েকদিনের ছুটিতে মহাবালেশ্বর বেড়াতে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোক ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন বলে মনে হল। প্রশ্ন করলেন —প্রতাপগড় যাবেন তো ভবানী মন্দির দেখতে।

সম্মতি জানিয়ে বললাম,—বহুদিনের বাসনা নিয়ে মহাবালেশ্বর যাচ্ছি, ভবানী মন্দির নিশ্চয় দেখব।

গল্প জমে উঠলো। শিবাজীর কথা উঠলো। তিনি বললেন—শিবাজী বাল্যে শিক্ষা নিয়েছিলেন দাদাজীর কাছে আর ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা নবমী তিথি, বৃহস্পতিবার, ২২ বৎসর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন রামদাস স্বামীর কাছে। তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য আর বৈভব একদিন তাঁর পরমপূজনীয় গুরুর চরণে অর্পণ করে কৌপীন ধারণের অনুমতি ভিক্ষা করেছিলেন। গুরুর আদেশে তা থেকে বিরত হন। ত্যাগের প্রতীক গৈরিকবসনই তাঁর জাতীয় পাতাকা "ভাগোয়া ঝাণ্ডা"। শিবাজীর কুলজী আলোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, এঁদের পূর্বপুরুষ থেকে শিবাজী পর্যন্ত অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান। এঁদের ওপর দেবী প্রসন্না। রামদাস স্বামীর জীবনীও অতি অপূর্ব। তিনি ভারতবাসীকে বৈদেশিক অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য, লোকের হিত সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গের সংকল্প গ্রহণ করেন। শিষ্যকেও তিনি এইভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। শিবাজীর লড়াই ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে। তিনি কোনদিন শত্রুর ধর্মপুস্তক, ধর্মমন্দির, স্ত্রীলোক ও শিশুদের প্রতি বিরূপ ব্যবহার করেন নি। যুদ্ধের সময় কেহ স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে গেলে বা মদ্যপান করলে প্রাণদণ্ড দিতেন। অপূর্ব নিষ্ঠা ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক ছত্রপতি শিবাজী। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসীম। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি বিশেষ বিচলিত হন, চার মাস কাল রায়গড় দুর্গে কাটান। তাঁর গল্প শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক বলে চলেছেন—শিবাজীকে রণকৌশলী, পরামক্রমশালী, বীর শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক বললেই ঠিক তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ত্যাগী, যোগী। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তিনি ভোগ-লালসায় কোনদিনই আকৃষ্ট হন নি। এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। ১৬৮০

খৃষ্টাব্দে ৩রা এপ্রিল তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবস। আজ এই বীর শ্রেষ্ঠ নেই। কিন্তু মারাঠার এই পাহাড়ের প্রতিটি দুর্গে ভবানীর বরপুত্রের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে এলেই স্বভাবতই এইসব কথা বার বার মনে হয়।

আমাদের বাস মাঝে ২।৩ বার দাঁড়িয়েছিল। এবার এল পাঞ্চগণি—উচ্চতা প্রায় ৪০০০ ফুট। শরীর ভাল করার জন্যে অনেকে এখানে আসেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে জল-হাওয়ায় শরীরের সঙ্গে মনকে সবল করে নিয়ে যান। যাত্রী এখানেও অনেক নামল। মহাবালেশ্বর এখান থেকে ১২ মাইল পথ। এখানকার বৃষ্টিপাত ৬০", কিন্তু ১২ মাইল গেলেই মহাবালেশ্বরের বৃষ্টিপাত ৩৫০"। শীত বেশ অনুভব করলাম। স্টেশনে যেমন বিশ্রামাগার, ভোজনালয় থাকে, বাস স্টেশনেও দেখলাম তারই অনুরূপ। চায়ের ব্যবস্থা ভালই ছিল। সাঁঝের বাতি দেওয়ার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম মহাবালেশ্বর। বোম্বে থেকে এর দূরত্ব ২০০ মাইল। ১৮২৮ সালে একে উদ্ধার করা হয়। এর কৃতিত্বের গৌরব তদানীন্তন রাজ্যপাল স্যার ম্যালকমের প্রাপ্য। কাছেই একটা হোটেলে উঠলাম। গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে শরীরটা সুস্থ করে নিলাম। পাহাড়ের গায়ে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। আলোকজ্জ্বল পাহাড়ের শোভা দেখার জন্য ওভারকোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে জানিয়ে দিচ্ছিল যে শীত কেমন। পাহাড়ের শীতের রাত্রি আমার খুবই উপভোগ্য। বেশ কিছুটা হেঁটে পায়ের জড়তা ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। ম্যানেজারবাবুকে ভবানী মন্দির দেখানোর ব্যবস্থার কথা আগেই বলেছিলাম। আসা মাত্রই তিনি বললেন আর একটি পরিবার আগামী কাল ভবানী মন্দির যাবেন। আপনারা তাঁদের সঙ্গে যাবেন। ট্যাক্সীও ঠিক করে রেখেছি। কুড়ি টাকা নেবে। আপনাদের দেখিয়ে আনবে সব।

নিশ্চিন্ত হয়ে আহারাদি সেরে শুয়ে পরলাম। সকাল সকাল উঠে তৈরী হয়ে নিলাম। বোম্বে বাসী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমার ঘরের সামনে হাজির। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রওনা হলাম। গাড়ি নেমে যেতে লাগল। এখান থেকে ১০ মাইল পথ গাড়িটি এমনি প্রায় নেমেই গেল ফিজগার‍্যাণ্ড ঘাট পর্যন্ত। গিরিসানু পরিবৃত অরণ্য-জগৎ থেকে মনে হয় বিচ্ছিন্ন অরণ্যকে পাশে রেখে পাহাড়ের রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটেছে। পুরানো গাছ, আর পাহাড়ের পাথর সাক্ষী দিচ্ছে এর অতীত ইতিহাস। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও দু একটি কুটির দেখা যাচ্ছে। জনমানবের সন্ধান নেই বললেই হয়। গাড়ি এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে কিছুটা গিয়েই সামনে পেলাম সিঁড়ি, এও প্রাঁয় ৩৫০টা --উঠে গিয়ে ভবানী মন্দির পেলাম। পাহাড়ের গায়ে এই উঁচু জায়গায় প্রাচীর বেষ্টিত এই দুর্গ। সামনে এসে দাঁড়ালে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। মনে হয় স্থান নির্ণয় ঠিকই হয়েছিল। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েই মনে হল ভেতরে এত অন্ধকার, কি করে মূর্তি দর্শন করব। নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে যখন আলোচনা করছি, এমন সময় দেখি একটি লোক একখানা বড় আয়না নিয়ে এসে সূর্যের দিকে ধরে ঐ আলোর জ্যোতি মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিল। ঘর হয়ে উঠলো আলোকজ্জ্বল। আমরা অষ্টভূজা মায়ের কালো পাথরের তৈরী মূর্তি দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে করলাম। মনে হল, এই সেই মা, যাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মারাঠার বীরসন্তান বীর যোদ্ধা রূপে — সর্বক্ষেত্রেই প্রায় জয়লাভে সমর্থ হন। ভবানী মূর্তি অবলোকনে জীবন সার্থক করলাম। অলৌকিক ঘটনাবলী যা শিবাজীর জীবনচরিতে পড়েছি সেইগুলো কেবলই মনের মধ্যে তোলপার করতে লাগল।

শান্তির নীড়, মায়ের কোলে বিশ্রাম নিয়ে তখনকার মত মনের সব গ্লানি মুছে ফেলে দিয়ে, উঠতে শুরু করলাম আরো ওপরের

দিকে, যেখানে অশ্বারোহী শিবাজীর বিরাট মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। ছত্রপতি শিবাজীর এই জীবজন্ত মূর্তি স্মরণ পথে এনে দিল এই বীরের জীবনগাঁথা—শত কোটী প্রণাম লও হে বীর—আপনা থেকেই মাথা নুইয়ে পরল।

এখানে এই উঁচুতে একটি চায়ের দোকান আছে। সকলেই চায়ের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিয়ে নেমে এলাম আফজল খাঁর সমাধির সামনে।

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় ১৬৫৯ সালে মারাঠা রাষ্ট্রকে অনেক বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। দিল্লীতে আওরংজেব তখন একে একে ভাইদের সরিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি করায়ত্ত করছেন। ভারতের দক্ষিণে তখন আদিল শাহ্ শিবাজীকে জব্দ করার জন্য বদ্ধপরিকর। এই বিজাপুর বাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচলনা করবে কে, এই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিল। তখন প্রতিভাবান আমীর আফজল খাঁ দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেন যে, ঘোড়ার পিঠে বসেই তিনি শিবাজীকে বন্দী করবেন। আফজল খাঁ শিবাজীর সঙ্গে বন্ধুত্বে ভান দেখিয়ে তলে তলে অত্যাচার চালিয়ে যান পুরোদমে। বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত তুলজাপুরে যেখানে ভবানীদেবীর আদি-মন্দির ছিল সেই মন্দির ও ভবানী মূর্তি আফজল খাঁ ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেলেন।

শিবাজী জাওলী জেলার মধ্যে এই প্রতাপগড় দুর্গে তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আফজল খাঁ আসছেন শুনে অনেকেই প্রথমত ভীত হয়েছিলেন। কারণ তখন তাঁর নিষ্ঠুর আচরণ ও শক্তির গল্প দেশময় ছড়িয়ে পরেছে। শিবাজী চিন্তা মগ্ন অবস্থায় ভবানী দেবীর স্মরণাপন্ন হলেন। অভয় বাণী এল, "আমি তোমায় রক্ষা করব। তুমি আক্রমণ কর আফজল খাঁকে। তোমার জয় হবেই।" পরে দু পক্ষের দূতের আনাগোনা চলল। আফজল খাঁর দূত কৃষ্ণজী ভাস্করকে শিবাজী নির্জন কক্ষে প্রবেশ

করিয়ে জেনে নিয়েছিলেন আফজল খাঁর মতলব। শিবাজীর দূত পন্থজী গোপীনাথ গেলেন আফজলের শিবিরে। ঠিক হল কেউ কারো ক্ষতি করবে না। সাক্ষাতের স্থান ঠিক হল প্রতাপগড় দুর্গের নীচে। সুসজ্জিত তাঁবু খাটানো হল। এই সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে আজ মনে হচ্ছে—সেই অপেক্ষমাণ আফজলের শিবাজী-বধের উৎবেলিত আকাঙ্ক্ষা। আরো মনে হচ্ছে ঐ দূরে দুর্গের দ্বার খুলে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে, ভাবানী দেবীর ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তিতে শক্তিমান শিবাজী নেমে আসছেন পালকীতে। পালকীর "হুম হুম" আওয়াজ আজও যেন শোনা যায় সেই অসি ঝন-ঝনানির শব্দের সঙ্গে।

১৬৫৯ সালের ১০ই নভেম্বর ছিল এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাক্ষাতের দিন। পালকী থেকে নেমে ধীর পদক্ষেপে মারাঠা বীর আফজল খাঁর দিকে এগিয়ে যান। খাঁ এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন শিবাজীকে। শিবাজী ছিলেন বেঁটে ও সরু, আফজল খাঁ ছিলেন দশাসই লম্বা। আফজল খাঁ গলা চেপে ধরলেন শিবাজীর। শিবাজীও ছিলেন প্রস্তুত। শিবাজীর পোশাকের তলায় ছিল লোহার জালের বর্ম, মাথায় ইস্পাতের টুপী। বস্ত্রের মধ্যে লুকানো ছিল বাঘনখ। আফজল খাঁর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী তাঁর বাঘনখ দিয়ে আফজল খাঁর পেট চিরে দুখণ্ড করে দেন। এই-ভাবেই আফজল খাঁর মৃত্যু হয়।

আজ এই সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে সব কথাই মনে হতে লাগল। শান্ত সমাহিত সুন্দর পরিবেশে সমাধির অবস্থিতি। বেলা হয়েছে অনেক। শরীর ক্লান্ত, মন ইতিহাসের স্তূপীকৃত ঘটনায় ভারাক্রান্ত। সাথী ফেরার আহ্বান জানালেন। এরা আজই ফিরে যাবেন বোম্বে। এদের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম এঁরা মধুচন্দ্রিমায় এসেছেন এখানে। সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে। গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার বললে যে, প্রতি বৎসর মাঘ মাসে প্রতাপগড়ে

একটি উৎসব হয়। তখন শিবাজীর মূর্তি পালকী করে এই কবর পর্যন্ত আনা হয়।

আমরা সেই একই পথ ধরে হোটেলে ফিরে এলাম। ফেরার পথে ড্রাইভার জানতে চাইল, আমরা মহাবালেশ্বরের মন্দিরে যাব কিনা। বললাম, যাব।

মহাবালেশ্বরের এই মন্দির পাথর কেটে গরুর মুখের মত করা হয়েছে নদীর মুখকে অনুকরণ করার জন্য। আশেপাশে ছোট ছোট মন্দিরও অনেক আছে। স্কন্দপুরাণে মহাবালেশ্বরের মহিমা থেকে জানা যায় যে, মহাবল আর অতিবল নামে দুই দৈত্য ছিল। শক্তিশালী এই দুই দৈত্যের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন দেবতারা। দেবতাদের সঙ্গে এই দৈত্যদ্বয়ের যুদ্ধ হয়। বিষ্ণুর হাতে অতিবল নিহত হলে যুদ্ধের গতি আরো ঘোরতর আকার ধারণ করে। দেবতাগণ মহামায়ার শরণাপন্ন হন। দেবগণকে রক্ষা করার জন্য মহামায়া মোহিত করেন মহাবলকে। মহাবল সন্তুষ্ট হয়। দেবতা-গণকে মহাবল বর চাইতে বললে, দেবগণ এই বর চান যে, "তুমি মহাবল আমাদের বাধ্য হও।" দৈত্য রাজী হয়। তবে তার শর্ত মহাদ্রির পর মহাবল নামে লিঙ্গ থাকবে। আর সেই লিঙ্গের মাথায় পঞ্চগঙ্গার উৎপত্তি হবে। মহারাষ্ট্রবাসীর কাছে মহা-বালেশ্বরের এই মন্দির আজ পরম তীর্থস্থান। শিবাজী ও তাঁর বংশধর এই তীর্থের পূজাদির ব্যবস্থা করেন। অনেক ভূ-সম্পত্তিও নাকি দেওয়া হয়েছিল এর পূজা পার্বণ চালানোর উদ্দেশ্যে।

ফিরে এসে নেমে পড়লাম নূতন মহাবালেশ্বরের বাজারে। ঘুরে ঘুরে বাজার দেখলাম, গাছে ঢাকা পথ দিয়ে গিয়ে কয়েকটি বিশেষ স্থান (Point) থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করলাম। সর্বোচ্চ পয়েন্ট হচ্ছে শুখনো পাহাড়ের ওপর 'সিনভোলা'। এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়।

পরের দিন বাসে চেপে ফিরে এলাম পুণায়। ট্রেন আমাদের ছাড়বে বেলা তিনটায়, আগে থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুটি সিট্ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বসে ছিলাম। বিশ্রামাগারে স্নান সেরে নিয়ে খাওয়ার ঘরে গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম খাবার কিছুতেই দেয় না। বার বার ডাকা সত্ত্বেও চলে যায় যেদিকে আধুনিকতম পোশাক পরিহিত মেয়েপুরুষ খাচ্ছে। আমাদের পোশাক ছিল অতি সাধারণ। চীৎকার করে যখন হৈ-চৈ শুরু করলাম তখন দেখি আমাদের দিকে দৃষ্টি পড়েছে। তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এসে হাজির। এদের ভাব দেখে মনে হল নিয়ম-শৃঙ্খলা বোধ কম—প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখি লোকে লোকারণ্য। এত লোক এই ট্রেনে বোম্বে যাবে। ট্রেন যখন এল তখন বুঝলাম তুলে দিতে এসেছিল অনেক লোক। একদল গেল ফিরে একদল চলল বোম্বে। আমরা গাড়িতে মাল তুলে বসেছি। সহযাত্রী ছিলেন যাঁরা তাঁরাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছেন। শেষ মুহূর্তে দরজা খুলে মুখে পাইপ গোঁজা এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। তাঁর আসনও নির্দিষ্ট ছিল। বসে পরেই বলেন—আপনারা কোথায় যাবেন?

—অজন্তার পথে।

—আপনারা দেশ দেখতে বেরিয়েছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—পুণার সব দেখলেন?

—যত দূর সম্ভব দেখলাম।

—ইন্দিরা-নিলয়ে গিয়েছিলেন?

—না যাওয়া হয়নি।

—অমন অপূর্ব হরেকৃষ্ণ মন্দির দেখলেন না!

—বললাম, কি ব্যাপার বলুন তো?

—আপনাদের দেশের কবি স্বর্গীয় কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় এখানে ইন্দিরা-নিলয়ে

হরিকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে গিরিধারীলালের মূর্তি আছে। এই বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অপূর্ব। প্রেম ও ভক্তির মূর্ত প্রতীক। ইন্দিরা দেবী যখন ভাবাবেশে মীরার ভজন গান করেন তখন শ্রোতৃবৃন্দ এবং তার সঙ্গে ভক্তবৃন্দ সকলেই তন্ময় হয়ে যান। এমন অপূর্ব ভজন শুনলেন না। এত কাছে এসেও বাংলার এমন এক সম্পদ দেখে গেলেন না।

—যদি আবার কখনও আসি তখন নিশ্চয় দেখে যাব। দুঃখ প্রকাশ করলাম।

আলোচনা চলতে চলতে অনেকটা পথ আমরা চলে এসেছি। দেখি গাড়ি একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোক হঠাৎ নেমে গেলেন। তারপরই দেখি চা আলুর বড়া আর দুচার খান টোস্ট নিয়ে একটা বেয়ারা তার পিছন পিছন আসছে। বললাম—কি ব্যাপার ?

বললেন —চা খান। মনে হচ্ছে আপনাদের মনটা খুবই খারাপ হয়েছে।

আমি বললাম—সেই কথাই বার বার মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোকের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গে পথ চলছি। গাড়ি যখন বোম্বের ভি, টিতে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা ৭টা। আমরা বিশ্রামাগারে ঢুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। মালপত্র বেশীর ভাগ ছিল রেলের গচ্ছিত অফিসে জমা। সেগুলো খালাস করে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। স্টেশনটি সব সময়ই যাত্রীমুখর। অবিরাম গতিতে যাচ্ছে আর আসছে। কুলিকে জিজ্ঞাসা করলাম —আরে উঠতে পারব তো ?

সে বললে—বাবু একটাকা দিলে ভাল ভাবে তুলে বসার স্থান তো করে দেবই—শুয়ে যাওয়ার স্থানও করতে পারব বলে মনে হচ্ছে।

সম্মতি জানালাম। জনতা এক্সপ্রেস ছাড়বে রাত্রি ৯।৩০মিঃ। গাড়ি যেই ঢুকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে কুলিটা একটা মাল কাঁধে আর একটা

মাল হাতে নিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ল। বিছানা ছুটো বেঞ্চে বিছিয়ে দিয়ে ঠিকমত তুলে দিল। গাড়িতে আমরা উঠে দেখলাম ভালই হয়েছে। তখন ঠিক যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত হল। তখনকার মত নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। ট্রেন যখন "জলগাঁও" স্টেশনে এল তখন ভোরের আলো পূর্ব দিগন্তে উঁকি মারছে।

গাড়ি থেকে নেমেই প্রথমে গেলাম টুরিস্ট অফিসে অনুসন্ধান করতে কিভাবে এখান থেকে অজন্তায় যাওয়া যায়। টুরিস্ট অফিসের কর্মীবৃন্দ সব সময়ই ব্যস্ত। অনেক চেষ্টায় তাঁরা কিছুটা সাহায্য করলেন। বললেন, এক ঘণ্টার মধ্যে অজন্তার পথে বাস ছাড়বে। এখান থেকে কিছুটা পথ গিয়ে বাস ধরতে হবে। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সকালের সব কাজ সেরে নিয়ে, মালপত্র রেলের তত্ত্বাবধানে রেখে রওনা হলাম। বাস স্টাণ্ডে এসে যা শুনলাম তা টুরিস্ট অফিসারের উক্তির সম্পূর্ণ উল্টো। বাস ছাড়বে বেলা ৯-৩০ মিঃ সময়। বহু কষ্টে ২ টি স্থান বাসে যোগাড় করে, কয়েক ঘণ্টা বসে থাকলাম। জলগাঁও থেকে অজন্তার পাদদেশ হল ৩৭ মাইল। পথ নির্জন। পথের ছুধারে পাহাড়ের শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নীল আকাশের দিকে। বাস আমাদের ছুটে চলেছে—উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে আবার কোথাও ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয়ে স্থানগুলিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত করেছে। মাঝে মাঝে গ্রামও অতিক্রম করে চলেছি। এই সব গ্রামের বাজারে আহার্যের মধ্যে প্রচুর কলা আর পেঁপে পাওয়া যায়।

অজন্তার পাদদেশে এসে দেখলাম বহু দর্শকের ভিড়। একটি ছোট হোটেল ওখানে আছে। সেখানে কোনমতে কিছু আহার সেরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম—অজন্তা গুহা দর্শনলাভের ইচ্ছা পূরণের জন্য। পৃথিবীর মানুষের কাছে এর আছে বিশেষ পরিচিতি। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই গিরিগুহার প্রতিষ্ঠা হয়। এক দিনে হয়নি। যুগে যুগে উঠেছে ভারতের

এই শ্রেষ্ঠ শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন। অপূর্ব পরিবেশে গিরিগুহাগুলির হয় জন্ম। মনোরম দৃশ্যাবলী বৌদ্ধ সাধকগণকে আকৃষ্ট করেছিল এই স্থানটি—এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁদেরই উৎসাহে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁদেরই কর্ম ও সাধনার ফলে শতাব্দীর দীর্ঘ পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল এই মন্দির। এই অজন্তায় গড়ে উঠেছিল চব্বিশটি বৌদ্ধ বিহার, পাঁচটি চৈত্য, অর্থাৎ দেব মন্দির। অজন্তায় আছে সর্বসমেত উনত্রিশটি অট্টালিকা। এর সব-গুলির উপর ওঠা কষ্টসাধ্য। চারটি চৈত্য ও তেহশটি বিহারের উপর ওঠা শক্ত নয়। মন্দিরগুলি যেমন চওড়া তেমনি উঁচু। ছাদ উঁচু ও খিলান করা। কোনও কোনও ছাদের গায়ে কাঠের বরগা বসানো আছে। যে সব ছাদে বরগা নেই, সেইসব ছাদের পাথর ঠিক বরগার মত কেটে তৈয়ারী করা। পুরান মন্দিরের থামগুলো আটপলা। আধুনিক স্তম্ভগুলির নিচে বেদী—তাদের গায়ে ও কার্নিশে কাজ করা। অজন্তার ছবিগুলি দেখলে, বহু পুরাকালে ভারতের কি বেশভূষা, আচার ব্যবহার ছিল, তার প্রমাণ কিছুটা পাওয়া যায়। চিত্রের মধ্যে অনেকগুলি দেবমূর্তি, জায়গায় জায়গায় রাজসভা, সভার মাঝে রাজা বসে আছেন; রাজার মূর্তি বেশ পরিষ্কার। কাঞ্চনবর্ণ চোখদুটি ছোট। ঠোঁট পুরু। কান বড় দাড়ি নেই, মুখে আছে পাতলা পাতলা গোঁফ। গলায় আছে মুক্তার পাঁচনলি, কোথাও কোথাও সোনার পাঁচনলি। বীরপুরুষের গায়ে জামা আছে। ধনুর্বাণ ও বর্শা নিয়ে মৃগয়ায় যাচ্ছেন, এমন চিত্রও আছে। তখনকার দিনে নিশ্চয়ই বন্দুকের প্রচলন ছিল না, সেটা চিত্রগুলো দেখলে বেশ মনে হয়। এই অজন্তাকে কেন্দ্র করে বহু ইতিহাস রচিত হয়েছে। চিত্রগুলি দেখলে এটা প্রমাণিত হয় যে দুহাজার বছর পূর্বে হিন্দুদের বিদেশ যাত্রা নিষেধ ছিল না। এমন সব চিত্রও দেখলাম। কোথাও রাজারা রাজ মহিষীদের সঙ্গে কথা বলছেন—কাছে আছে সহচরী। দেখলে স্বভাবতই এই কথা মনে হয়

যে তখন পারস্য ও ইয়োরোপ থেকে যবন কন্যা রাজন্যবর্গদের আনন্দ দানের জন্যে আসতেন। আমরা একটার পর একটা গুহা দেখে চলেছি, গুহার ভেতরে কোথাও কোথাও বেশ অন্ধকার। আলোর সাহায্য না নিলে দেখা যায় না। সরকারের ব্যবস্থা আছে যে পাঁচটাকা দিলে, সরকারী বাতি পাওয়া যায়। সরকারী লোক সেই বাতির তার টেনে টেনে দেওয়ালে বাতি দেখায়। তাতে অন্ধকারের অসুবিধা দূর হয়। আমাদের পয়সা খরচ করে এই আলোর ব্যবস্থা করতে হয়নি, কারণ একদল ইয়োরোপীয় টুরিস্ট আমাদের সঙ্গেই অজন্তার গুহাগুলি দেখতে এসেছিলেন। তাঁদেরই ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা সব গুহাগুলির চিত্র বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম। এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে ইয়োরোপীয় টুরিস্টরা সঙ্গে এনেছিলেন ফটো তোলার সব রকম সাজ-সরঞ্জাম। চলচ্চিত্র তোলার ব্যবস্থাও তাঁদের ছিল, সেই সঙ্গে গাইডের বিস্তারিত বিবরণগুলি টেপ রেকর্ডে তুলে নিচ্ছিলেন।

যখন এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এসে এক জায়গায় বসলাম, তখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম—এইভাবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সমস্ত চিত্রের ইতিহাসের বর্ণনাগুলি টেপ রেকর্ড করে লাভ হবে কি?

উত্তরে মহিলাটি বললেন—দেশে ফিরে গিয়ে বাড়িতে বসে ছেলে-মেয়েদের ও বন্ধুবান্ধবদের দেখাব ও গাইডের বর্ণনাগুলি টেপের মাধ্যমে শোনাব।

তখন বুঝলাম, সত্যই এরা টুরিস্ট—কতখানি আগ্রহ নিয়ে তারা এসেছে। মনে হল এই দলের সঙ্গে অনেক দেশের লোক ছিল। গাইড ইংরাজীতে বর্ণনা দিচ্ছিল—সেটা প্রয়োজন মত রাশিয়ান ভাষায় ও অন্য ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছিল তাদের নিজেদেরই লোক। অজন্তার গুহাগুলির মধ্যে কিছু হীনজান সম্প্রদায়ের—সেগুলো অবশ্য সাদাসিধে, আর কিছু মহাযান—যেগুলো অলঙ্কৃত। বৌদ্ধ মূর্তি আছে ভিতরে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে ঐ গুহাজার

বৎসর আগে বুটপরা সৈনিক আর মেয়েদের হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। এমন অনেক জিনিস আমাদের দৃষ্টিতে এল যা আধুনিক যুগে ব্যবহৃত হচ্ছে। বহুকাল ধরে এই ভাবে থাকার জন্যে ও দর্শকবৃন্দের হাতের স্পর্শে অনেকগুলি চিত্র অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অজন্তার চিত্রের রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা কঠিন। প্রতিটি চিত্র যেন জীবন্ত। এমন সব মূর্তি আছে—যাকে ভিন্ন দিক দিয়ে দেখলে, ভিন্নরূপ ও ভিন্ন মূর্তিতে দেখা যায়। আমরা যখন তন্ময় হয়ে বিভিন্ন গুহার রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম, আর ভাবছিলাম এই ভারতে শিল্প কারুকার্য কি অপূর্ব সেই সময় গাইড বলতে আরম্ভ করেছে, কিভাবে এই নির্জন দুর্গম অরণ্যের ভেতর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের আবিষ্কার কাহিনী।—একদল দুঃসাহসী ইংরেজ সৈন্য নিজাম রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ১৮১৯ সালে। তারা পথ চলতে চলতে দেখতে পায় পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একটি সার চার মাইল ধরে চলেছে। এরই মধ্যে অনেকগুলি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে। তারই মধ্যে দিয়ে চলেছে সেই সৈনিকদের অভিযান। সে অভিযান কত যে দুঃসাহসিক ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। সামনের বিচিত্র অপরূপ দৃশ্য তাদের ক্রমশই এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তারা জানত না যে নিজাম রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই পার্বত্য গ্রামের নাম অজন্তা। এই উপত্যকা গিরিবেষ্টিত ও ঘোড়ার ক্ষুরের মত। তাদের দৃষ্টিগোচরে এল—পাহাড়ের গায়ে আঁকা বহু জীবজন্তুর মূর্তি। তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল— ভেতরে কি বস্তু আছে তা জানার জন্যে তাদের শতগুণ আগ্রহ বেড়ে গেল। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল মন্দির এবং তারই ভেতরে অসংখ্য প্রাসাদ। এই শুভ সংবাদ তারা পৌঁছে দিল তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে। ক্রমশই সভ্যজগতে এই নূতন আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়ল। এই আবিষ্কারকে সার্থক রূপ দিয়েছেন—সেনাপতি স্যার জেমস এণ্ডারসন। লেফ্‌টন্যান্ট ব্লেক

ফারগুসান গ্রিফিৎস, শ্রীমতী হ্যারিংহ্যাম, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅসিত-কুমার হালদার ও সমরেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়গণ অজন্তার প্রতিলিপি নিতে শ্রীমতী হ্যারিংহ্যামের সঙ্গে আসেন বলে জানা যায়। রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে এইভাবে সমস্ত শীতের দুপুরটা ঘুরে ঘুরে শরীরটা খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, তেষ্টাও লেগেছিল খুব—কাছেই দেখি একটি ইঁদারা, অনেকেই জল তুলে পান করছে, এমন কি মেম সাহেবরাও সেই জল পান করছে। আমরাও সেই জল পান করে শরীর মন দুইকেই শান্ত করলাম। সত্যই এমন নির্জন পাহাড়ের মধ্যে এমন সুস্বাদু পানীয় জল কখনই আশা করতে পারিনি। সেখানকার লোকে বললে যে, এই জল পানে পেটের সব গোলমালই ভাল হয়ে যায়। আমাদের অজন্তা দেখার কাজ শেষ হয়েছে। মনের মণি-কোঠায় তখন এঁকে নেবার চেষ্টা করছি সেইসব অপূর্ব Fresco Paintings, ভাবছি কি অপূর্ব শিল্প-কলার সৃষ্টি। এখন মনের মধ্যে বুদ্ধমূর্তির কথা বার বার উদয় হচ্ছে—দেখেছিলাম একটি বৌদ্ধ মূর্তি —যার প্রকাশ তিনরকম। বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়—কখন সৌম্য, কখন হাস্য, কখন রুদ্রমূর্তি। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে ঔ-রাঙ্গ-বাদ। বাস যেখানে দাঁড়ায় সেখানে এসে দেখি জনসমুদ্র। দেখে মনে হল আজ আর বোধ হয় বাসে স্থান পাওরা যাবে না। এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। অনুসন্ধানে জানলাম যে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে বোম্বেতে, তারই প্রতিনিধিগণ একপিঠের ভাড়ায় দুপিঠ যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে ভারত-দর্শনে বেরিয়েছেন—তাই আজ এত ভিড়। সেখানে অনেক সাহিত্যিককেও দেখলাম। তাঁরাও বিব্রত, ফেরার সুযোগ করে উঠতে পারছেন না। অজন্তা থেকে ঔরাঙ্গবাদ ৬৭ মাইল। বহু কষ্টে প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একটি বাসে দুটি আসন সংগ্রহ করে রওনা হলাম ঔরাঙ্গবাদ।

ঔরাঙ্গবাদ যখন পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় ৯-৩০ মিঃ। পৌঁছে সে রাত্রে যে দৃশ্য দেখলাম তা আরও মর্মান্তিক। হোটেলে, গেস্ট-হাউসে, ডাকবাংলোয়, ধর্মশালায় কোথাও রাত্রি-বাসের স্থান পেলাম না। বহু খোঁজাখুঁজির পর শেষ সম্বল স্টেশন বিশ্রাম-গারে এলাম। সেখানেও না স্থানম্ তিল ধারণম্। তখন কোন উপায় না দেখে স্ত্রীকে মেয়েদের বিশ্রামাগারে দিয়ে—বহু ভদ্র-লোকের সঙ্গে স্টেশন প্ল্যাটফরমে বিছানা বিছিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। জীবনে আমাদের এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। চোখে ঘুম নেই, যদিও শরীর খুবই ক্লান্ত, কারণ পেটেও কিছু নেই। যখন সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া স্টেশনে এলাম, সেখানে খাবারের দোকানগুলো সবই বন্ধ। পরিচয় হয়েছিল লাহিড়ী মশায়ের সঙ্গে। তিনিও আমাদের মত প্ল্যাটফরমে সারারাত কাটিয়েছিলেন। দারুণ শীতে বাধ্য হয়ে প্ল্যাটফরমের ঐ খোলা জায়গায় যাত্রীরা শুয়ে রাত কাটালো।

সকালে উঠে কোনমতে মুখ ধুয়ে খাওয়ার ঘরে ঢুকে কিছু খেয়ে নিলাম আমরা। স্ত্রী আর ইলোরা দেখতে যেতে রাজী নন। যা হোক কোনমতে ব্যবস্থা করা গেল। লাহিড়ী মশায়ও সস্ত্রীক-ছিলেন। একটি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। তারাই সব দেখাবে। ইলোরা আন্দাজ ১৮ মাইল দূর। গাড়ি সোজা পথ দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর ক্রমশ পাহাড়ের ভেতর প্রবেশ করতে লাগল। তারপরই উঠতে লাগল উঁচুতে। একটি মনোরম দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি, সমস্ত রাতের ক্লান্তি ভুলে নয়নমুগ্ধকর দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে যেন বিলীন করে দিয়েছি।

দু হাজার বছর পূর্বে ভারতের সন্তান স্থান নির্ণয় করেছিলেন এমনই পরিবেশের মধ্যে, যেখানকার যাওয়ার পথই এত মনোরম। জানি না ইলোরার ভেতরে গেলে কি দেখব। শুধু যে এই কথাগুলো আমিই ভাবছি তা নয়, সবাই এই একই চিন্তায় নিমগ্ন। সমস্ত

পথটায় কারোর মুখে কোনও কথা ছিল না। গাড়ি যখন ইলোরার দরজায় এসে ব্রেক করে দাঁড়াল, তখন আমাদের সকলেরই চিন্তার তার ছিঁড়ে গেল।

বৌদ্ধ হিন্দু ও জৈন এই তিন পৃথক ধর্মাবলম্বীদের দেব-মূর্তি আছে এই গুহার মধ্যে। গাইডের কথায় জানা যায় যে, চৌত্রিশটা মূর্তির মধ্যে বারোটা বৌদ্ধ, পাঁচটা জৈন ও বাকীগুলি হিঁদুর।

বৌদ্ধ গুহাগুলি বহু পুরানো। বৌদ্ধের পর এসেছে ব্রাহ্মণ, তারপর এসেছে জৈন।

এর নির্মাণ কাজ কবে আরম্ভ হয়েছে আর কবে শেষ হয়েছে, তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টের ৩১০ থেকে ৫৫০ অব্দের মধ্যে—"বিশ্বকোষ" এই মত দেন। প্রথম গুহায় বৌদ্ধবিহার। এখানে আছে বড় বড় ৮টি ঘর। দ্বিতীয়টি নাটমন্দিরের মতন। কয়েকটি গুহা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই গুহাগুলিকে পাশে রেখে ওপরে উঠলে মহাবরাড়া গুহা এটি একটি বিহার। এর গভীরতা ১১৭ ফুট বিস্তার ৫৮½ ফুট। ২২টি থামের পর ছাদ। দেখলে মনে হয়, এখানে দরবার হত। এরই বাঁদিকের প্রবেশ দ্বারে উপবিষ্ট আছেন ধ্যানাবস্থায় বুদ্ধ মূর্তি। এর পর আছে অনেকগুলো বিহার ও জলাশয়। আরও একটু ওপরে উঠলে বিশ্বকর্মার গুহা। একটা প্রবাদ আছে এখানে নাকি অনেক ছুতোর পূজা দেওয়ার জন্য আসে। আরও কিছু ওপরে গেলে দেখা যায় বুদ্ধদেব, পদ্মপাণি, বজ্রপাণি এবং এ ছাড়াও অনেক দেব-মূর্তি। এরপর তিনতলা গুহা। এর কারুকার্য অতি মনোরম। দেওয়ালে নানারকম ফুলকাটা, নানারকম মানুষ আঁকা। মনে হয় এই গুহাটি বৌদ্ধদের মহাযান সম্প্রদায় তৈরী করেছিলেন।

গাইড বলে চলল—পাহাড়ের মাঝখানে ত্রিতল গুহার কাছ থেকেই হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দির আরম্ভ হয়েছে। এগুলো দেখলে মনে হয় যে শিল্পনৈপুণ্যে ও অসাধারণ ভাস্কর্য কার্যে

বৌদ্ধদের তৈরী গুহার চেয়ে অনেক উন্নত এবং সুসাজ্জত। রাবণ-কা-খাই, কৈলাস, রামেশ্বর তেলিকাগণ, নীলকণ্ঠ—এইসব প্রধান।

ইলোরার কৈলাস বা রাজমহল ভারতের গুহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। পাহাড় খুদে এতবড় দেবালয় খুব কমই দেখা যায়। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অসাধারণ দেবভক্তি ও অলৌকিক কীর্তি না দেখলে মনে হয় জীবন সার্থক হল না।

আমরা যতদূর সম্ভব গুহাগুলি দেখে ক্লান্ত শরীর আর ভক্তিতে ভরপুর মন নিয়ে ফিরে এলাম ট্যাক্সির দিকে। সবগুলি গুহা-মন্দির নিখুঁতভাবে দেখতে গেলে বহু সময়ের প্রয়োজন। ফেরার পথে আমরা এলাম দৌলতাবাদ দুর্গে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুর্গ। দুর্গের সর্ব উচ্চে এখন কিছু ঘর আছে। দুর্গ দেখা শেষ করে আমরা এলাম ঔরঙ্গজেবের সমাধিতে। ইতিহাস বিখ্যাত সম্রাট, তাঁর সমাধি অতি সামান্য, আড়ম্বরহীন। তারই ইচ্ছানুযায়ী এই সমাধি হয়েছে তৈরী। সবশেষে আমরা এলাম মুক্বারায়। তখন সূর্যদেব পশ্চিমে ঢলে পড়ার উপক্রম। ঔরঙ্গজীবের সন্তান, তাঁর মায়ের সমাধি, পৃথিবীর বিখ্যাত তাজমহলকে অনুকরণ করে তৈরী করিয়েছিলেন। দেখলে মনে হয় এটা একটি ছোট তাজমহল। স্থানটিও অতি মনোরম।

অজন্তা দেখতে হলে জলগাঁও বা মানমদ হয়ে ঔরাঙ্গবাদ এসে বাসে বা ট্যাক্সীতে যাওয়া যায়। আমাদের ফিরে যেতে হবে জল-গাঁওতে কারণ মালপত্র রেখে এসেছি সেখানে—ভুলপথে আসার কষ্ট ভোগ করতেই হবে।

আমাদের এই দীর্ঘদিনের যাত্রা এখানে শেষ করে ফিরে এলাম জলগাঁও।

